চিত্ররেখা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭১

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদক :
মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ —শচীন বিশ্বাস

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

তিন প্রহর
উপনিবেশ (তিন পর্ব)
স্বর্ণসীতা
শিলালিপি
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী
বিদূষক
মেঘের উপর প্রাসাদ
সাহিত্য ও সাহিত্যিক
সাহিত্যে ছোটগল্প
ইত্যাদি

এক

সামনে মেহেদির বেড়া, মাথার ওপরে বুগেনভিলিয়ার ঝাড়—অজস্র লাল ফুলে তার পাতাগুলো পর্যন্ত আড়াল হয়ে গেছে। এপাশেব উঁচু ইউক্যালিপ্টাস গাছটার অনেক ওপরে একটা বুলবুল কিছুদিন ধরেই বোধ হয় তাব সঙ্গীকে ডাকাডাকি করছিল। রাস্তাব ও পারের জলা থেকে বাতাসে পানা, কলমী আর কাদার গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল এক জোড়া মোষ—ওখানে স্নানপর্ব চলছে তাদের। ছাড়া-ছাড়া সাদা মেঘেব ফাঁকে টুকবো টুকরো আকাশে রঙ ফুটে উঠছে—যেন তুষারবর্ণা কোনো বিদেশিনীর চোখের নীলিম দৃষ্টি।

বাংলা দেশ।

শোভন ব্যানার্জি মেহেদির বেড়ায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কপালের সামনে চুলগুলো পাতলা হয়ে এসেছে, তার ওপরে বাতাসেব ছোঁয়া যেন কার কোমল হাতের আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। একবারের জন্য মা-কে মনে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ভবে তার জল আসতে চাইল।

প্রথম যখন এসেছিল, ভেবেছিল এখানে সে থাকবে না; এখানকার জমি-জমা, ঘরবাড়ী, পোল্ট্রিফার্ম—সব বিক্রী করে দিয়ে আবার আগ্রায় ফিরে যাবে। শোভনলাল অ্যাণ্ড কাম্‌তাপ্রসাদ কোম্পানির পেট্রোল-পাম্প আর মোটর রিপেয়ারিংয়ের ব্যবসা এমন কিছু হয়তো লাভের নয়, কিন্তু যা আসে তা তার একার প্রয়োজনের পক্ষে ঢের বেশি। বাংলা দেশ তার চেনা নয়, জানা নয়, এমনকি বেশিক্ষণ ধরে বাংলা বলতে সে যে খুব আরাম বোধ করে তাও নয়। ক্রমাগত কথার ফাঁকে ফাঁকে 'জী' আর 'মগর' বলে ফেলা তার

নিজের কানেই বেয়াড়া শোনায়। এখানকার ভিজে জল-হাওয়া, এ দেশের মানুষ আর তাদের হালচাল—এগুলো যে তার ভালো লাগবে না—এ-কথা সে-ও জানত। কাজেই এখানকার বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সে আবার তার চেনা জগতে ফিরে যাবে—এইটিই তার মনে ছিল।

কিন্তু—

—বাবু, চা কি এইখানেই নিয়ে আসব ?

শোভনলাল ফিরে তাকাল। মনোহর মণ্ডল—তার চাকর। মনে পড়ল, একটু আগে এক পেয়ালা চা করতে বলেছিল মনোহরকে।

সামনে দিয়ে একটা বোঝাই বাস চলে গেছে একটু আগে—হাওয়ায় ধুলোর একটা সূক্ষ্ম আবরণ ভাসছিল, উঠছিল পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধ। শোভনলাল বললে, না, এখানে নয়। তুই বাইরের ঘরেই চা দে, আমি আসছি।

বাগানের ভেতর দিয়ে সে বাড়ীর ভেতরে ফিরে এল।

বাবাকে শোভনলাল শ্রদ্ধা করতে পারে না, শ্রদ্ধা করবার পক্ষে যথোচিত কোনো কারণ নেই ; এমনকি মৃত্যুর সময় যখন সমস্ত সম্পত্তি তিনি ছেলেকে লিখে দিয়ে যান, তখন তাঁর সেই প্রায়শ্চিত্তেও শোভনলালের মনকে এতটুকু নরম করতে পারেনি। কিন্তু এই বাড়ীটার জন্যে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে সে বাধ্য। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বাংলো ধরনের এই বাড়ীখানি শুধু সুন্দরই নয়—আশ্চর্য রুচির পরিচয়! বাবা শৌখিন আর্টিস্ট্ ছিলেন—ঘর ভরা তাঁর আঁকা ছবিতেই তার পরিচয় দিচ্ছে ; কিন্তু শুধু ছবিই নয়। এই ছিমছাম বাংলো বাড়ীটা, চারদিকে ঘিরে এই ফুলের বাগান, ফুলে পাতায় এই রং মেলানো—কী অপূর্ব মন আর দৃষ্টি ছিল এদের পেছনে! আর বাড়ীটা এমন সুন্দর না হলে কি এইভাবে এখানে মন বসত শোভন ব্যানার্জির ?

অথচ, কী কুৎসিত জীবন কাটিয়ে গেছেন এই আর্টিস্ট ভদ্রলোক।

অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার তার মাকে মনে পড়ল।

মার গালের ওপর সেই পোড়া চিহ্নটা—বাবা জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরেছিলেন। ফর্সা পিঠের ওপর চাবুকের কালো কালো দাগগুলো এখনো তার চোখের সামনে কিলবিল করে একদল সরীসৃপের মতো। মাতাল—দুশ্চরিত্র লোক, এই কারণেই স্ত্রীর ওপর সন্দেহের তার আব অন্ত ছিল না। মাঝরাতে নেশার ঝোঁকে বাড়ী ফিরেই জিজ্ঞেস করত: এক্ষুনি—আমি সিঁড়িতে উঠতেই—আমার পাশ দিয়ে কে দৌড়ে পালিয়ে গেল, কে সে?

কেউ নয়। মাতালের মন গড়া ছায়ামূর্তি। কিন্তু স্ত্রীর ওপর চাবুক চালাতে তাতে বাধে না, লাথিতে লাথিতে তাকে জর্জরিত করে দিতে দ্বিধা হয় না বিন্দুমাত্রও। যার নিজের চরিত্রের কোনো বালাই নেই, স্ত্রীর সতীত্বেব সন্দেহ কববার তারই সব চাইতে বেশি অধিকার।

কদর্য ইতিহাসের শেষ নেই। সেগুলো মনে করতেই সমস্ত শরীর কুঁকড়ে ওঠে।

মা পাবতপক্ষে কিছু বলতেন না। যেদিন ঝড় বৃষ্টির রাতে সাত বছরের ছেলেকে সুদ্ধ স্বামী তাঁকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে নিজের পথ তাঁর নিজের কাটতে হয়েছে; তিনবছর বাপের বাড়ীর অপমানের অন্ন গিলে কোনো মতে আই-এ পাশ করে যেদিন থেকে তিনি পশ্চিমের একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অতীতের সব কিছু দু হাতে মুছে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু মুছতে পারেননি মাথার সিঁদুর আর ভাঙতে পারেননি হাতের সেই দু-গাছা শেকল—তাঁর শাঁখা। ওইটুকুতেই তাঁর সংস্কারে বেধেছিল।

কুড়ি বৎসর পর্যন্ত—বি এ পাশ না করা পর্যন্ত—একজন সাধারণ স্কুল মিস্ট্রেসের একমাত্র সন্তান শোভন ব্যানার্জি এ সব খবর কিছুই জানত না। তারপর মা একবার অসুখে পড়লেন। সেই সময় তাঁর বিকারের ঘোরে প্রথম কিছু কিছু অসংলগ্ন ইতিহাসের টুকরো শোভন শুনতে পেলো। তারপরে ন্যূনাভাবে একটু একটু করে মার কাছ থেকে সব জেনেছে সে। ইচ্ছে করে মা বলেন নি, কিন্তু তাঁর এক-একটা দুর্বল মুহূর্তের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত আবিষ্কার করেছে শোভন, যে অংশগুলো মা সম্পূর্ণ গোপন করেছেন, সে ফাঁক-গুলো ভরে নেওয়াও অসম্ভব হয়নি তাব পক্ষে।

আর বাপকে ঘৃণা করেছে। একটা দানবীয় মানুষের মূর্তি এঁকেছে কল্পনায়, অক্ষম প্রতিহিংসার জ্বালা বয়ে বেড়িয়েছে বুকের ভেতর।

মার মৃত্যুর পরে তাঁর বাক্সের ভেতর থেকে একখানা ফটো বেরিয়ে এসেছিল।

খুব সম্ভব বিয়ের পরেই তোলা—তার মানে অন্তত পঁচিশ বছর আগেকার। একটা খামের ভেতরে পাওয়া গেল ছবিখানা। এতদিনে ছবির রঙ একটু লালচে হয়ে গেছে, তবু পরিষ্কার চেনা যায়। একজন তার মা—তরুণী; ছিপছিপে পাতলা চেহারা, মুখে সুখ আর লজ্জা জড়ানো, কপালের টিকলির নীচে বড়ো একটি সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় ভারী নেকলেস—নববধূ বলে চিনতে দেরী হয় না। পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহ একটি পুরুষ, চওড়া কপাল, ওলটানো চুল, ভারী চোয়াল—মোটা ফ্রেমের চেশমার নীচে জ্বলজ্বলে চোখ; ব্যক্তিত্ব আর শক্তি যেন ঝকঝক করছে চেহারায়।

শোভন বুঝেছিল, তার বাপ!

কল্পনায় যে দানবকে সে এতদিন গড়ে তুলেছে, তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। কিন্তু এই ভদ্র, এই দীপ্ত মুখোসের নীচে কী ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ারই না বাসা বেঁধে ছিল! আর ভেতরকার সেই

জন্তুটার মূর্তি তার মাও কি সেদিন, সেই ছবি তোলার সুখলগ্নে—যুণাক্ষরে বুঝতে পেরেছিলেন! যদি পারতেন, তাহলে ওই সুখ আর লজ্জার আলোটুকু তাঁর মুখে কোথাও থাকত না—একটা অমানুষিক আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে যেতেন তিনি!

ছবিটা দেখবামাত্র একটি ইচ্ছাই তার প্রবল হয়ে উঠেছিল। একটি আদিম, অন্ধ আকাঙ্ক্ষা।

মার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মূর্তিটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়, কিংবা কালি ঢেলে বীভৎস বিকৃত করে দেয়। কিন্তু পারে নি। ছবির ভেতরে যেন মা-র তরুণী চোখদুটি ছলছল করে উঠেছিল, যেন একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ ভেসে এসেছিল তার কানে: ও ছবি আমার। পঁচিশ বছর ধরে নিজের প্রাণের মধ্যে আমি ওকে লুকিয়ে রেখেছি। তোমার বাপকে তুমি ঘৃণা করতে পারো, কিন্তু কী অধিকারে আমাব ছবি তুমি নষ্ট কবতে চাও?

যেখানকাব ছবি, সেই খানেই আবার লুকিয়ে রেখেছে শোভনলাল। সেই লাল ফিতেয় বাঁধা চিঠির ছোট্ট তাড়াটি যেমন তার স্পর্শের বাইরে, এ ছবিও তেমনি কবে মার গোপন বেদনার মধ্যেই লুপ্ত হয়ে থাকুক।

চা-টা শেষ হয়ে গিয়েছিল, শোভন ব্যানার্জি একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চাইল। অপূর্ব ল্যাণ্ড্‌স্কেপ একখানা। সারি সারি নারিকেল, শালগাছ আর অসীম সমুদ্রের ওপর রক্তলাল সন্ধ্যা; এখানে ওখানে নানা আকারের কালো কালো পাথরের ওপর ঢেউ ভাঙছে, রাঙা আলোর ফেনা ঠিকরে পড়ছে আঁজলা আঁজলা রক্তজবার মতো। অনেক দূরের পিঙ্গল দিগন্তে একটা জাহাজের ভূতুড়ে মূর্তি—কয়েকটা হলুদ আলোর জোনাকি ফুটে আছে তার গায়ে। ছবির বাঁ-দিকে ছোট একটুখানি স্বাক্ষর দেখা যায়: এস. ব্যানার্জি, অক্টোবর, ১৯৫২।

মা-র পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ফটো তুলেছিল—এই আশ্চর্য

জীবন্ত ছবিটা যে তাঁরই আঁকা এ কথা ভাবতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মাতাল হয়ে মাঝরাতে বাড়ী ফিরে যে মা-কে চাবুক মারত, তার চেহারা কী রকম? স্নেহ মমতায় ভরা তার এমন স্নিগ্ধ মাকে ঝড়ের রাতে যে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিতে পেরেছিল—সেই জানোয়ারটাকে কেমন দেখতে? ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইডের গল্প নিতান্তই তা হলে রূপকথা নয়!

এখানে আসবার পর এস. ব্যানার্জির আরো কাহিনী তার কাছে এসেছে। জমিদারী, বিষয় সম্পত্তি অনেক ছিল—ছাই করে উড়িয়েছে দু'হাতে। তারপর একদিন—হয়তো নিজের উদ্দাম জীবনে ক্লান্ত হয়ে, অথবা কোনো একটা ঘা খেয়ে, কিংবা নিজের অতীতের হিসেব নিকেশ করে একটা দুরন্ত মানসিক অনুতাপে, এই লোকটা মোড় ফিরল! গ্রামের অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সব বিক্রী করে দিয়ে এখানে এই বাংলো বাড়ীটা তৈরী করল। গড়ে তুলল পোল্ট্রির ব্যবসা। শিক্ষিত লোক, বুদ্ধি ছিল, রুচি ছিল, ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে ফেলল। তখন ডুবে গেল কাজের ভেতর, অবসর সময়ে ছবি আঁকত, আর—আর বই পড়ত। শোভন বইয়ের শেল্‌ফ নাড়াচাড়া করে দেখেছে। পোল্ট্রির ওপর কিছু বই ছাড়া বাকী সব কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বই, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী, ইংরেজ কবিদের অনেকগুলো কম্‌প্লিট ওয়ার্কস এবং কিছু জার্মান কবিতার বই। এস. ব্যানার্জি যে ভালো জার্মানও শিখেছিলেন, পাতায় পাতায় মার্জিনাল নোটই তার প্রমাণ।

তবু এই লোকটাই যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লম্পটের মতো এক সময় বীভৎস জীবন কাটিয়েছে, চতুর্থ শ্রেণীর মাতালের মতো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে। কেমন করে এ হয়—কী করে এ সম্ভব!

হাতের চুরুটটা অন্যমনস্ক অবসরে নিবে গেছে, অ্যাশট্রের ওপর সেটা নামিয়ে শোভন উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে গেল বইয়ের শেল্‌ফ্‌টার দিকে। টানতেই বেরিয়ে এল রবার্ট ব্রিজেস।

শোভন পাতা খুলল। দাগ দেওয়া একটি কবিতা। এস. ব্যানার্জির খুব ভালো লেগেছিল।

"Awake, the land is scattered with light, and see,
Uncanopied sleep is flying from field and tree :
And blossoming boughs of April in laughter shake ;
Awake, O heart, to be loved awake, awake]"

প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যের কবিতা। এপ্রিলেব উজ্জ্বল পুষ্পিত সকালের অপরূপ উল্লাস।

"Lo all things wake and tarry and look for thee :
She looketh and saith, 'O sun, now bring him to me.
Come more adored, O adored—"

শোভন বইটা বন্ধ করল। দেওয়ালের ছবি, এই কবিতা, এই সুরুচির পরিচয় বাংলো বাড়ীটি, এমন কি মৃত্যুর আগে সেই অনুতপ্ত চিঠিখানা—মা-র কথা মনে পড়লে সব একটা বিরাট প্রহসনের মতো মনে হয় যেন। ফর্সা পিঠে কালো কালো সাপের মতো চাবুকের দাগ, বাঁ গালে সেই পোড়া চিহ্নটা—যেখানে একটা জলন্ত চুরুটের মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। আর মা! কী স্নেহ কী মমতা দিয়ে গড়া! না—এস ব্যানার্জির অপরাধের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কোনো প্রায়শ্চিত্তই তার পাপের একবিন্দু মুছে দিতে পারবে না।

বইটাকে শেল্‌ফের যথাস্থানে রেখে শোভন নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ল আবার। সামনে সমুদ্রে রক্তসন্ধ্যা। জোর করে চোখ দুটোকে বন্ধ করে ফেলল সে।

বাইরে থেকে সেই বাংলা দেশের গন্ধ। বাগান থেকে ফুল, পাতা মাটির ঘ্রাণ। বাড়ীর সামনে রাস্তা দিয়ে লরী বাস মোটরের চলা চল্‌তিতে পোড়া গ্যাসোলিন আর ধুলোর গন্ধ। পাখির ডাক, পায়রার পাখার শব্দ, কোথায় একটা গোরু তার পালানো দুরন্ত বাচ্চাকে ডাকছে, তার একটা মধুর গম্ভীর আওয়াজ। সব মিলে নেশা ধরায়।

এই ঠাণ্ডা শান্ত ঘরটায় যেন চেতনার ওপর ঘুমের মায়া ঘনিয়ে আসতে থাকে।

কিন্তু আগ্রায় ফিরে যাওয়া উচিত। কী হবে এখানে পড়ে থেকে।

—বাবু।

চম্‌কে চোখ মেলল শোভন। মনোহর।

—কী হয়েছে?

—এক বাবু দেখা করতে এসেছেন।

—কে বাবু? শোভন ভ্রূকুঞ্চিত করল। এই ক'মাসের ভেতরেই এখানকার লোকের সঙ্গে তার যে-টুকু আলাপ-পরিচয় ঘটেছে তা আদৌ সুখের নয়। তাই কেউ দেখা করতে এলেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

—ঠিক বলতে পারলুম না।

—গ্রামের লোক নয়?

—না। তবে আশপাশের কোথাও থাকেন বলে মনে হয়। মুখখানা যেন অনেকবার দেখেছি।

—আচ্ছা, ডেকে আন।

লোকটি ঘরে আসবার আগে নিজেই যেন একটু তৈরী হয়ে নিল শোভন। যেন এখনি তার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে, সতর্ক হল তারই জন্যে। এখানে আসবার পরের দিনগুলো এখনও সে ভোলেনি। মাঝ রাতে বাড়ীর দরজায় জানলায় ঢিল-পাটকেল পড়ত, মুরগীর খোঁয়াড়ে চোরের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল, পথে বেরুলে নানা রকম টীকা-টিপ্পনী যা কানে আসত তাদের কোনটাই শরীর জুড়িয়ে দেয় না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়েছে তাকে। তারপর বিদ্বেষের ধার একটু একটু করে ভোঁতা হয়ে এসেছে, আরো অনেক উপদ্রবের মতো তার থাকাটাই সহ্য হয়ে গেছে গ্রামের লোকের। কিন্তু দু-চার জনের সঙ্গে সামান্য আলাপ ছাড়া এই সাত আট মাস

ধরে সে এখনো নিঃসঙ্গ। ব্যবসার কাজে কলকাতা থেকে যে-সব লোক আসা-যাওয়া করে, তাদের সকলকেই মনোহর চেনে। কিন্তু মুখখানা যেন অনেকবার চেনা—তার অর্থ—আশপাশের কেউ হবে। আর তা যদি হয়—

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। লোকটি ঘরে ঢুকল।

মাঝারি ধরনের রোগা চেহারা, মাথায় ধূসর চুল, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ একজোড়া। লোকটির মধ্যে এমন কিছু নেই যে একবার দেখবার পর দ্বিতীয়বার দেখা হলে তাকে চিনতে পারা যাবে। গায়ে ময়লা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, হাতে একটি রং-জ্বলা সাদাটে ছাতা, খুব যত্ন করে পাকানো।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে।

—বসুন।

লোকটি সামনের কাউচে শোভনের মুখোমুখি বসল। একটু সংকুচিত—যেন এই ধরনের আসনে বসতে ঠিক সে অভ্যস্ত নয়। একবার বিব্রতভাবে ঘরটির চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর দেওয়ালের গায়ে একটু দুঃসাহসিক একটি নারীমূর্তির দিকে চোখ পড়তেই যেন সভয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলে।

শোভন নিজের চামড়ার কেস থেকে একটা চুরুট বাড়িয়ে ধরল তার দিকে: চলবে?

লোকটি দ্রুত গলায় বললে, না না, থাক।

মৃদু হেসে আধপোড়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলে শোভন। ছ'সাত মাস আগে হলে কোন অপরিচিত প্রৌঢ়কে সে এমনভাবে চুরুট এগিয়ে দিত না কিংবা তার মুখের সামনে চুরুটের ধোঁয়াও ছাড়ত না। কিন্তু এখন ইচ্ছে করেই সে এগুলো করে, জোর করেই উদ্ধত হয়ে ওঠে। অহেতুক বিদ্বেষ আর শত্রুতা ছাড়া যাদের কাছ থেকে সে কিছুই

পায় নি, তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাবার প্রয়োজনও সে বোধ করে না।

লোকটি একবার গলা খাঁকারি দিলে।

—আমার নাম আশ্বনী হালদার। আমি পাশের গ্রাম ঘোষদীঘি থেকে আসছি।

—বেশ, বলুন।

—ওখানকার শ্রীধর চাটুজ্জে মশায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনি।

শোভন হাসল: না, শুনিনি। আমি এদিককার কাউকেই চিনি না।

অশ্বিনী হালদার আশ্চর্য হল: চাটুজ্জে মহাশয়ের নাম আপনি শোনেন নি? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অনেককাল—এখন রিটায়ার করে গ্রামে আছেন। কিন্তু রিটায়ার করেছেন বলে বসে নেই মশাই। জমিজমা আছে—সে-সবের তদারক করেন, তাছাড়া চালের কলও করেছেন। আমি তাঁরই কর্মচারী।

—বেশ। কিন্তু আমি কি করতে পারি তাঁর জন্যে? তাঁর কি কিছু ডিম দরকার?

অশ্বিনী হালদার হাসল: না, ডিম নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান তিনি।

—আমার সঙ্গে?—শোভনের ভুরু কুঁচকে উঠল আবার: কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি না।

—তিনি আপনাকে চেনেন—যদিও সামনা-সামনি কখনো দেখেন নি। আগে আপনার বাবার সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

বাবার সঙ্গে! শোভনের বুকের ভেতর যেন চাবুকের ঘা পড়ল একটা। হাতের চুরুট থেকে মোটা ছাইয়ের টুকরো পড়ল গায়ের জামাটার ওপর।

অশ্বিনী হালদার বলে চলল: অনেকবার বলেছেন নিজেই দেখা করতে আসবেন আপনার সঙ্গে। আজকে আসবার জন্যে তৈরীও

ছিলেন, কিন্তু সকাল থেকেই হাঁটুতে বাতের ব্যথা উঠে একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। তাই আমায় বললেন, 'অশ্বিনী, তুমিই যাও, আর আমার নাম করে এই চিঠিখানা দিও।'

অশ্বিনী হালদার পকেট থেকে বড়ো একখানা চৌকো লেফাফা বের করে এগিয়ে দিলে শোভনের দিকে।

শোভন খাম খুলল।

ছাপানো লেটার হেড। শ্রীধরচন্দ্র চ্যাটার্জী, বি, এল, বি-সি-এস। রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ল্যাণ্ডলর্ড, প্রোপাইটার—চ্যাটার্জী রাইস মিলস্। পোস্ট্ ঘোষদীঘি, জেলা চব্বিশ পরগনা।

তারপর অনেকদিন সরকারী চাকরি-করা হাতের টানা ইংরেজি লেখার চিঠি একখানা। 'মাই ডিয়ার মিস্টার ব্যানার্জি'—

বাংলা করলে যা দাঁড়ায় তা মোটামুটি এই।—যদিও আমরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নই, তবু তুমি আমার বন্ধুপুত্র এবং সে হিসাবে তোমাকে একান্ত আপনার জন বলে দাবি করি। তুমি অনেকদিন এখানে এসেছে, তবু আমি যে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি সে ত্রুটি আমারই এবং তার জন্যে আমি একান্ত দুঃখিত। যাই হোক, এজন্যে তুমি আমায় অবশ্যই ক্ষমা করবে এবং আগামী রবিবার মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমার এখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হলে আমি অতিশয় আনন্দলাভ করব। আমি নিজেই তোমার কাছে যেতাম, কিন্তু অভিশপ্ত হাঁটুর বাত আজ সকাল থেকে আমাকে অচল করে ফেলেছে। আশা করি, রবিবার দুপুরে তোমার সান্নিধ্য লাভের আনন্দে আমি বঞ্চিত হব না। তোমার বিশ্বস্ত—ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে শোভন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। প্রথমেই মনের ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন সাড়া তুলল: আমি যাব না—আমি কিছুতেই যাব না। এখানকার মানুষগুলোকে চিনে নিতে অনেক দাম দিতে হয়েছে আমাকে। কে বলবে, এ-ও তাদের নতুন কোনো চক্রান্ত কিনা!

আর পিতৃবন্ধু! তার যে বাপ—

শোভন একবার কামড়ে ধরল চুরুটটা—দেওয়ালের সেই রক্তফেনায় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনের রাস্তা দিয়ে লরী কিংবা বাস জাতীয় কিছু একটা চলে গেল, তার শব্দ আর মৃদু কম্পন অনুভব করা গেল। বাইরে থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় আসতে লাগল বাংলা দেশের গন্ধ, ঘরের ঘড়িটা টকটক করে বেজে চলল, আর অশ্বিনী হালদার দুই হাতের ভেতরে গোল করে পাকানো ছাতাটা চেপে ধরে, জড়ো-সড়োভাবে চেয়ে রইল শোভনের মুখের দিকে।

—আপনি আসছেন তো?

—অ্যাঁ? —শোভনের যেন চটকা ভাঙল।

—আসবেন তো পরশু?

এক মুহূর্তের অনিশ্চয়তা। তারপর শোভন বললে, আচ্ছা যাব।

অশ্বিনী হালদার উঠে দাঁড়ালো।

—বাবু খুব খুশি হবেন। কিন্তু আমি কি নিতে আসব আপনাকে?

—দরকার নেই, ঘোষদীঘি কোনদিকে সে আমি জানি। আমার স্কুটার আছে, চলে যাব তাতে।

—দু'ছত্র যদি দয়া করে লিখে দেন বাবুকে—

নিমন্ত্রণ গ্রহণের লিখিত স্বীকৃতি নিয়ে বিদায় হল অশ্বিনী হালদার। আর ভ্রূকুঞ্চিত করে একভাবে বসে রইল শোভনলাল, কাজটা ভালো হল কিনা এখনো বুঝতে পারছে না।

দুই

জমিদারী হয়তো এস. ব্যানার্জি—অর্থাৎ শৈলেশ্বর ব্যানার্জির অনেক ছিল। জমিদারী আইন পাশ হওয়ার আগেই নিজের হাতে তার বারো আনা শেষ করেছেন শৈলেশ্বর, ভালোই করেছেন। মৃত্যুর ছ' সাত বছর আগে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছিলেন, তার ফল এই পোল্‌ট্রি ফার্ম, সঙ্গে লাগাও কিছু ধানী জমি। পোল্‌ট্রি এমন কিছু বড়ো নয়—শ' পাঁচেক ডিম হয় দৈনিক, হাঁস-মুরগী চালান যায়। জমিটা থাকায় ধান আসে, বছরের আলু আসে, তরি-তরকারীও পাওয়া যায়। আর এই ছবির মতো বাংলো ধরনের বাড়ীটি—শিল্পীর হাতে তৈরী। শোভন ব্যানার্জির প্রয়োজনের চাইতেও অনেক বেশি। কখনো কখনো আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে যায়, আবার এক-এক সময় অসহ্য আত্মগ্লানিতে বোধ হতে থাকে, একদিন কাউকে না জানিয়ে আবার আগ্রায় ফিরে যায় সে।

অশ্বিনী হালদার চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ একভাবে বসে রইল শোভন। রিটায়ার্ড বি-সি-এস শ্রীধর চ্যাটার্জির চিঠিটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে—এগিয়ে গেল পোল্‌ট্রির দিকে।

তারের জাল দেওয়া ঘেরা জায়গায় একদল মুরগীর ছানা ছুটোছুটি করছে, চিলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। মুরগী চরছে ইতস্তত—দুটো বড় বড় লেগহর্ন মোরগ ঝুঁটি ফুলিয়ে শক্তি পরীক্ষার পাঁয়তারা ভাঁজছে। পুকুর সাঁতার দিচ্ছে হাঁসের পাল—তাদেরই একটি দল ছাড়া হয়ে একটা বেনাঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে—সাপের মতো কেবল গলাটা বেরিয়ে আছে তার। শোভন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঠোঁট ফাঁক করে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে

আওয়াজ করল—অর্থাৎ ডিম পেড়ে বসে আছে তার ওপর। সব মিলে একটা শান্তি আর বিশ্রাম চারিদিকে। ঘাসে, গাছপালায় ঘন সবুজের রং, এক জায়গায় একগুচ্ছ কাশফুল ফুটে উঠেছে—যেন রাজহাঁসের বুকের খানিক নরম পালক কেউ ছড়িয়ে রেখেছে সেখানে।

লাল টালীর দু খানা ঘর একপাশে। অফিস। বারান্দায় একরাশ নতুন ঝুড়ি স্তূপাকার হয়ে আছে—সোনার মতো তাদের রং। ওদিকে একটা খড়ের গাদা। কয়েকটা মুরগী ধানের দানা সন্ধান করছে সেখানে।

শোভন অফিসে পা দিলে। দুজন কর্মচারী সেখানে। দুজনেরই বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে—তার বাবার আগের পুরোনো আর বিশ্বাসী লোক। একজন একটা কপিয়িং পেনসিল দিয়ে ডিমের গায়ে নম্বর দিচ্ছিলেন, আর একজন খাতাপত্র খুলে হিসেব দেখছিলেন। মুকুন্দ মাইতি আর বলাই দাস। শোভনকে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন।

শোভন একটা চেয়ার টেনে নিলে।

যিনি হিসেব দেখছিলেন তিনিই মুকুন্দ মাইতি। একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন শোভনের দিকে।

—একটা নতুন পার্টি স্যার। ডেলি দেড়শো ডিমের সাপ্লাই চায়।

শোভন চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

—কী করে দেবেন? আমাদের বাঁধা পার্টির চাহিদাই তো আমরা কুলিয়ে উঠতে পারি না।

—পারা যেত। —মুকুন্দ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: গত বছর সেই এপিডেমিকটা হয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল। তা কী লিখব ওদের?

—কী আর লিখবেন? জানিয়ে দিন, আপাতত আমরা পারছি না, আসছে জানুয়ারী থেকে চেষ্টা করে দেখব।

বলাই দাস বললেন, কিছু স্টক এই সময় বাড়ান স্যার। আরো নানা জায়গা থেকে ডিম্যাণ্ড আসছে।

—ভাবছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শোভন। কিন্তু স্টক বাড়ানোর কথা ভাবছে না, অন্য আর একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। হঠাৎ মুকুন্দবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি শ্রীধর চ্যাটার্জিকে চেনেন?

মুকুন্দ আর বলাই এক সঙ্গেই উৎকীর্ণ হয়ে উঠলেন। মুকুন্দ বললেন, কোন্ শ্রীধর চ্যাটার্জি?

—ঘোষদীঘির। আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখন রাইস্ মিল করেছেন।

ওঃ, চ্যাটার্জি সাহেব! —মুকুন্দ আর বলাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

—চেনেন তাহলে?

—আজ্ঞে ওঁকে আর কে না চেনে বলুন? বলাইবাবু ফিক করে হেসে ফেললেন: একটা খাকি হাফ প্যান্ট আর শোলার টুপি মাথায় দিয়ে, হাতে বেত নিয়ে গ্রামের ভেতর ঘুরে বেড়ান আর চাষা ভূষো সকলের সঙ্গে ইংরেজি বলেন। গতবার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সবসুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশটা ভোট—

শোভনের মুখে মেঘ ঘনাচ্ছে দেখে মুকুন্দবাবু বলাইবাবুকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, যেতে দাও, ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে কী হবে? কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেবের খবর কেন জানতে চাইছেন স্যার? কিছু অর্ডার দিয়েছেন নাকি?

—না, অর্ডার নয়। আসছে রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন করেছেন আমাকে।

—নেমন্তন্ন!—এবার মুকুন্দ দস্তুর মতো চমকালেন এবং সেটা বলাইয়ের মধ্যেও সংক্রামিত হল।

—এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?—শোভনের ভুরু কুঁচকে এল।

—মানে, ও-রকম কৃ—বলাইবাবু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু চোখের

দৃষ্টিতে মুকুন্দবাবু বারণ করলেন তাঁকে। কথাটা তুলে নিয়ে বললেন, মানে ওঁর তো এ ধারণা, এ অঞ্চলে দেখবার মতো ভদ্রলোক একটিও নেই। তাই—

নেহাৎ অন্যায় ধারণা নয়—শোভন ভাবল। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা, শত্রুতা, বাপের সম্পত্তির দখল নিতে গিয়ে মানুষের নোংরামির বীভৎস পরিচয়—সব মিলিয়ে এ ছাড়া আর কী মনে হতে পারে? একটু চুপ করে থেকে বললে, আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল, তাই নয়?

বলাইবাবুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। কয়েকটা সরু সরু রেখা ফুটল মুকুন্দবাবুর কপালে।

হিসেবের কাগজপত্রগুলো টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রেখে মুকুন্দবাবু আস্তে আস্তে বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি পুরোনো লোক, অনেক কথাই জানি। বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু এক তরফা।

—এক তরফা? তার মানে?

—মানে কত টাকা যে কর্তাবাবুর কাছ থেকে নিয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই। কর্তাবাবুর তো এক সময়—কী বলে—মুকুন্দ একবার কাশলেন: মানে—মন মেজাজ খুব স্বাভাবিক ছিল না, কে যে কী বাগিয়ে নিত খেয়ালও করতেন না! আপনাদের বিষয় সম্পত্তিরও অনেকটাই উনিই জলের দরে কিনে নিয়েছেন। এদিক থেকে যদি ওঁকে বন্ধু বলেন—

—হুঁ, বুঝেছি।

টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের একটা কাগজ-চাপা টেনে নিয়ে শোভন তার শীতল মসৃণতার ওপর আঙুল বোলালো খানিকক্ষণ। না—সে আশ্চর্য হয় নি। এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এই রকমই কিছু একটা সে আশা করেছিল। রিটায়ার্ড বি-সি-এস—মিল্‌ওনার—সব সমান।

পকেট থেকে চামড়ার কেস বের করে তা থেকে একটা চুরুট

ধরালো শোভন। আস্তে আস্তে বললে, তা হলে—লেকিন—আপনাদের কী আইডিয়া? যাবনা বলছেন?

—না যাওয়াই উচিত—বলাইবাবু জবাব দিলেন।

—কী ছেলেমানুষি করছ বলাই!—মুকুন্দবাবু অসন্তুষ্ট হলেন: না স্যার, নেমন্তন্ন করেছেন যখন, যাবেন বইকি। তবে একটু সতর্ক থাকবেন আর কি! স্বার্থ ছাড়া তো চাটার্জি সাহেব কখনো এক পা-ও চলেন না। তাই—

—হয়তো বিনি-পয়সায় ডিম মুরগী বাগাবার মতলব।

—আঃ, বলাই।

বলাইবাবু বললেন, তোমার মতো আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই মুকুন্দদা। এ কথা ভুলছ কেন, দু দিন বাদেই শীত পড়বে, তখন সাহেবের ক্রিসমাস কেক চাই, মুরগী চাই? তাই এখন থেকেই গুছিয়ে রাখলেন।

—ক্রিসমাস কেক?—শোভন চোখ তুলল।

জবাব বলাইবাবুই দিলেন: বাঃ—উনি তো খ্রীস্টান।

খ্রীস্টান! শোভন আশ্চর্য হল: ছাটস এ নিউজ! বাংলা দেশের এই অঞ্চলে যে ক্রীশ্চান ফ্যামিলিও আছে তা তো জানতুম না।

—ক্রীশ্চান ফ্যামিলি থাকবে কেন স্যার?—মুকুন্দবাবু বললেন, ওঁর বাবা ছিলেন হাই-স্কুলের পণ্ডিত—ন্যায়তীর্থ স্মৃতিতীর্থ এইসব উপাধি ছিল, কখনো জামা-জুতো পরেন নি, চাদর চটি জুতো নিয়েই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে গেলেন।

—তাঁর ছেলে ক্রীশ্চান?

—তাই তো হল স্যার। ছাত্র ভালো ছিলেন চাটার্জি সাহেব, স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করলেন, সরকারী চাকরি পেলেন। তারপর রংপুর না বাঁকুড়া কোথায় থাকবার সময় সেখানকার ক্রীশ্চান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে—

সেই পুরোনো গল্প—চিরকালের ইতিহাস। অনেক কালাপাহাড়

আর তানসেনের কাহিনী। 'প্রীত না মানে জাত কুজাত, ভুখ না মানে—'। আগ্রার সেই সম্পৎলালকে মনে পড়ল, কোন এক নবাবী রক্তের মেয়ের জন্যে সে-ও নিজের ধর্ম ছেড়ে দিল, উর্দু শায়ের আউড়ে বলেছিল: 'একদিকে শাহী তখত, আর একদিকে হাসিনা মেহবুবা। তুই কোনটা চাস্? কবি বলেন, ওরে মূর্খ—রাজত্ব মাটির, রূপ তো বেহেস্তের। স্বর্গ ছেড়ে মাটি বেছে নিবি, তুই কি এমনিই কমবখত?' শোভন হাসল। একটু পরে জিজ্ঞেস করল: গোলমাল হয়নি তা নিয়ে?

—হয়েছিল বইকি। পণ্ডিতমশাই যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন চাটার্জি সাহেব দেশে এলে বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও যেতেন না। আমাদের কর্তাবাবুর এখানে এসেই উঠতেন। আর কর্তাবাবু তো কাউকে গ্রাহ্যই করতেন না, তাঁকে আর কে কী বলবে?

—বুঝেছি।—শোভন কাগজ-চাপাটায় আঙুল বুলোতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, আমি যদি ওঁর ওখানে খেতে যাই, তা হলে ক্রীশ্চানের নেমন্তন্ন খেয়েছি বলে জাত যাবে না তো আমার?

বলাইবাবু এবং মুকুন্দবাবু হেসে উঠলেন এবার।

মুকুন্দবাবু বললেন, না স্যার, যুদ্ধের পর ও-সব পাট মিটে গেছে। জাত নিয়ে এখন আর কেউ অত মাথা ঘামায় না। আজকাল তো বামুন-বাড়ীতেই মুরগী পোষা চলছে—কে দেখতে যাচ্ছে ও-সব? এই তো সেদিন এক সদ্‌গোপের ছেলে কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে এক বামুনের মেয়েকে বিয়ে করল—কে রুখতে পারল তাদের? দিনকাল একদম বদলে গেছে এখন।

অফিস ঘরের ঘড়িটায় টং টং করে এগারোটা বাজল।

শোভন উঠে দাঁড়ালো। মুকুন্দবাবু আর বলাইবাবু খেতে যাবেন এখন। তিনটে নাগাদ ফিরে আসবেন আবার। সে না গেলে তাঁরা যেতে পারছেন না।

—তা হলে যেতেই বলছেন ওঁর ওখানে ?

—হ্যাঁ স্যার, কেন যাবেন না ?—মুকুন্দবাবু উৎসাহ দিলেন : ডেকেছেন যখন, যাওয়াই উচিত। আরো বিশেষ করে কর্তাবাবুর সঙ্গে যখন এতটা জানাশোনা ছিল। কিন্তু ডাকে চিঠি লিখেছেন নাকি ?

—না, এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। অশ্বিনী হালদার।

—বুঝেছি, ওঁর চালের কলের ম্যানেজার।

—ম্যানেজার ? চেহারা দেখে তো—

বলাইবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন : চাটার্জি সাহেবের ম্যানেজারের ওর চাইতে ভালো অবস্থা হয় না স্যার।

—আঃ কেন বাজে বকছ বলাই !—মুকুন্দবাবু ধমক দিলেন একটা।

একটু পরেই ওরা দু'জনে চলে গেলে শোভন এসে পুকুরের বাঁধানো ঘাটটায় বসল। গভীর নীল জল, হাঁসের পাল চরছে। জলটা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে লোভ হয়, কিন্তু পুকুরটা গভীর, শোভন সাঁতার জানে না। ঘাটের দু' তিনটে জলে ডোবা শ্যাওলা পড়া পৈঠের দিকে নজর পড়ল তার। দুপুরের রোদ পড়ে জলের তলার অনেকটা পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। একটা ছিপ নিয়ে বসলে মাছ ধরা যায় —কিন্তু শোভন কোনোদিন মাছ ধরেনি তার জীবনে।

অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে থাকতে তার আবার মা-কে মনে পড়ল।

মা দুঃখ করতেন : বাঙালীর ছেলে হয়ে তুই কখনো বাংলা দেশ দেখলিনে বাবা।

: কেন মা, এই তো সেদিন ঘুরে এলুম কলকাতা থেকে।

: দূর কলকাতা কি আর বাংলাদেশ রে। ওতো মস্ত একটা শহর। পাড়াগাঁয়ে না গেলে কি আর দেশ দেখা যায় ?

: কী আছে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে? খালি পানা পুকুর আর ম্যালেরিয়া।

মা-র চোখ ছলছল করে উঠত।

: কে বলেছে তোকে এ-সব কথা?

: কেন সবাই তো বলে।

: ওরা না জেনে বলে।—মা একটু চুপ করে থাকতেন। ওদের বাসার ছাদের ওপর চাঁদ উঠত, হাওয়া দিত, গাছের পাতা কাঁপত, শব্দ উঠত তার। দূরে কেল্লাটাকে দেখা যেত একটা দৈত্যপুরের প্রাচীর, ফোর্ট স্টেশন থেকে গাড়ীর এঞ্জিনের আওয়াজ আসত। পথে 'পেঠাওলা' হাঁক ছেড়ে যেত—তার ঠেলাগাড়ীর ওপর কাচের ভেতর চিনির দানার চিকচিকে স্বচ্ছ নীল পেঠাগুলোকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত, একটা খোলা এক্কার ওপর সোয়ার হয়ে আঠারো জন লোক হো-হো করতে করতে চারদিক কাঁপিয়ে চলে যেত। সামনের হোটেলটার দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো আতরওলা কাঁপা কাঁপা ভাঙা গলায় ডেকে বলত: 'গুলাবী আতর—রাত কী রাণী!' আর তারই মাঝখানে বসে মা বাংলাদেশের গল্প বলতেন।

যে দেশে মা-র ছেলেবেলা কেটেছিল সে এখন পাকিস্তান। সেখানকার নদী, ধানক্ষেত, পুকুর, নারকেল বন, ছেলেবেলায় মা কেমন করে পুকুরে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার শিখেছিলেন তার কথা। শোভন রূপকথা শুনত।

সে দেশ নয়, তবু বাংলা দেশ। সেই পুকুর। জলের ভেতর, ফোটোতে দেখা সেই কিশোরী মায়ের মুখ ফুটে উঠল। কলসী ভাসিয়ে সাঁতার দিচ্ছেন, পদ্মের পাপড়ির মতো দু-খানি পা জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে।

শোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা-র কথা আর সে ভাববে না। সেই ফর্সা ধবধবে পিঠের ওপর কালো কালো সাপের মতো কতগুলো চাবুকের দাগ। সে-স্মৃতি জেগে উঠলেই ঘৃণায় সারা গা জ্বলে ওঠে

তার। এস ব্যানার্জির এই অভিশপ্ত ঐশ্বর্য দুই পায়ে চটকে ফেলে তার আবার আগ্রায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে, যাওয়ার আগে বাড়ীর সমস্ত ছবিগুলো এক সঙ্গে জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দেয় সে।

শোভন আবার সিঁড়ির দিকে চোখ ফেলল। সূর্যের আলোয় স্বচ্ছ জলের ভেতর শ্যাওলাধরা সিঁড়িতে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মাছের ঝাঁক। রোদে গা জ্বলছে এখন। কী নীল পুকুরটার জল—ঝাঁপিয়ে স্নান করতে পারলে সারা শরীরের জ্বালা যেন জুড়িয়ে যেত।

কিন্তু শোভন সাঁতার জানে না।

তখন আবার শ্রীধর চাটার্জিকে মনে পড়ল।

লোকটা তার মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে একটা। অশ্রদ্ধার সঙ্গে মিশেছে দারুণ কৌতূহল। এই বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে একটা বেয়াড়া লোক এবং বিধর্মী ক্রীশ্চান, কিভাবে তার দিনগুলো কাটিয়ে চলেছে, নেভা চুরুটটাকে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে সেইটেই অনুসরণ করতে চাইল শোভন।

তিন

পরদিন স্কুটার নিয়ে শোভন গেল কলকাতায়।

শনিবারের বিকেল, পথে মোটরের ভিড়। বাসে ঝুলন্ত মানুষের শোভাযাত্রা। একধারে লোহা লক্কড় বোঝাই একটা লরী কাত হয়ে পড়ে আছে, খুব সম্ভব কাল রাতে কিংবা আজ সকালে অ্যাকসিডে হয়ে গেছে একটা। লোকের ভিড় নেই সেখানে, কৌতূহলও না। এই পথটায় কতগুলো-প্রাণ যায় প্রতিবছর?

শোভন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আগ্রা থেকে আলিগড়, আলিগড় হয়ে দিল্লী। সে পথেও অসংখ্য গাড়ী চলে কিন্তু এর সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না তার। ছবিটাই আলাদা। ধু-ধু মাঠে মেঘবরণ গমের ক্ষেত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা। কখনো কখনো নবাবী আমলের জমিদার বাড়ী সাবেকী দুর্গের ধরনে লাল ইটের মস্ত প্রাচীর আর উঁচু বুরুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ বুঁজে স্কুটার চালানো যায় মাইলের পর মাইল। পথের ধারে বটের ছায়ায় কোনো হালুইকরের দোকান থেকে পুরী-লাড্ডু কিনে খাওয়া। চলতে চলতে কত পীরের দরজা, ভাঙা মসজিদ, কত শ্যাওলাধরা কবরের সার। 'দিল্লী হনুজ দূর্ অস্ত?' না—আর দূরে নেই, ওই তো শহরতলী ফুটে উঠেছে সামনে।

শোভন সজাগ হল। লেভেল ক্রসিং। সার বাঁধা গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে।

কেমন কুশ্রী, কেমন শ্বাসরোধী মনে হয়। ভিড় ভিড় ভিড়। লক্ষ্মীছাড়া চেহারার কতগুলো জীর্ণ বাড়ী। এক জায়গায় খানিকটা কাদা জলের মধ্যে একপাল শূয়োর। গাছের পাতা পর্যন্ত ধুলোয় বিবর্ণ। মা-র গল্পে শোনা বাংলা দেশ এ নয়। ধুলো আর ভিড়ে

কদাকার আগ্রা বাজারের সঙ্গে একাকার, শুধু তার সমৃদ্ধিটুকুই নেই এখানে।

শাঁখের আওয়াজ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল নীল রঙের ইলেকট্রিক ট্রেনটার ঝড়। গেট খুলল। আবার সেই পথ, গাড়ী বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলা। এপথে স্কুটার চালিয়ে সুখ নেই। এখানে জীবনে বাধা—চলায় বাধা। কোন বাংলা দেশের কথা মা বলেছিলেন?

বাজার। ভিড়। কোথা থেকে মাইকে বক্তৃতার একটা টুকরো সমস্ত কোলাহল ছাপিয়েও কানে এল: 'তাই সারা জীবন তিনি সৌন্দর্য আর মুক্তির তপস্যা করেছিলেন—সৌন্দর্য আর মুক্তি—'

সৌন্দর্য আর মুক্তি। দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে কিছু? শৈলেশ্বর ব্যানার্জি সৌন্দর্যের তপস্যাই তো করেছিলেন জীবনভোর, কিন্তু মুক্তি কি তাঁর ছিল? কী কুৎসিত একটা বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়ে কাটিয়ে গেলেন লোকটি।

স্কুটার চলল। ভিড়—গাড়ী—কোলাহল। কলকাতা।

মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসের সামনে, ফুটপাথে স্কুটার রেখে শোভন মেসটায় গিয়ে উঠল। নীচে মিষ্টির দোকান। পাশের অন্ধকার সিঁড়ি আর নোনাধরা দেওয়াল পেরিয়ে তেতলায় গিয়ে মামার ঘরে পৌঁছুল। এই তার একমাত্র আত্মীয়—যার সঙ্গে আগ্রা থেকেও মা কিছু কিছু যোগ রাখতেন। শোভন জানত, এই একমাত্র বড়ো ভাইটি ছাড়া ত্রি-সংসারে মা-র আর কেউ নেই।

তেতলার একটি মাত্র ঘর, ওপরে টালীর চাল। এই ঘরের একা বাসিন্দা মামা। ঘর খানা নেহাৎ যে ছোট তা নয়, কিন্তু প্রফেসার মামার বই-পত্রেই বারো আনা ঠাসা। একটি তক্তপোশে আধ খানা বিছানা, আলনায় কিছু জামা কাপড়, বই খাতায় উপচে পড়া টেবিল, দেওয়ালে ঝুলন্ত একটি সেতার। কুঁজোর ওপর কানাভাঙা একটি কাঁচের গ্লাস—একটা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জামও আছে। বিছানার ওপর সাদা এবং হলুদ রঙের দু'টি নিদ্রিত বিড়াল।

মামার পোষ্য। মামার বয়স বাহান্ন তিপান্ন হবে, ব্যাচেলার নন, উইডোয়ার। সাতাশ-আটাশ বছর আগে বাচ্ছা হতে গিয়ে মামীমা মারা যান; তারপরে মামা আর বিয়ে করেননি।

মামা টেবিলে বসে কতগুলো কী খাতাপত্র দেখছিলেন, শোভনের ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে মাথা না তুলেই বললেন, আয় শোভন।

শোভন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল একবার। হালকা সন্ধ্যা ছড়িয়েছে। মামার ঘরের আলোটা একটা হলুদ বিষণ্ণতা বিছিয়েছে অনেকদিন চুন না-পড়া কালচে দেওয়ালে। মামার ছেঁড়া গেঞ্জীর ভেতর দিয়ে সাদা পিঠ আর পৈতের রেখাটা চোখে পড়ছে। হঠাৎ সব মিলে কি রকম করুণ মনে হল।

—আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন দোর গোড়ায়?

—না দেখেই কী করে বুঝলে আমি এসেছি?

—ও রকম সিঁড়ি কাঁপানো পায়ের আওয়াজ তুলে বাঙালী ভদ্রলোক আসে না—মামা মুখ ফিরিয়ে হাসলেন, ও ডাল রুটির পদধ্বনি। ছাত্রদেরও অমন করে আসবার সাহস নেই। ডিডাকশন করে কী দাঁড়ায়?

মামা দর্শনের অধ্যাপক।

হেসে শোভন ঘরে ঢুকল। বিছানায় বেড়াল দুটোকে তাড়া দিয়ে বললে, নাম—নাম শিগ্‌গীর বিল্লীকে বাচ্চাও! কী আবদার! দু চক্ষে এই জীবগুলোকে দেখতে পারি না আমি।

অনিচ্ছাসত্ত্বে বেড়াল দুটো নামল। পিঠ বাঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল, তারপর শোভনের দিকে বিরূপ দৃষ্টি ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

শোভন বিছানায় বসল। মামা চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিলেন তার দিকে।

—কী করছিলে মামা?

—আর বলিস কেন—ছেলেমেয়েদের এক পাল খাতা। সব বিবর্ণ।

বাংলা হয়ে কী কাণ্ড যে হয়েছে। এদের পরিভাষার একটাও যদি আমার মাথায় ঢোকে। সে যাক—তুই যে হঠাৎ?

—খুঁটিনাটি জিনিসপত্র কিনব কতগুলো। কিন্তু সে কোনো কাজের কথাই নয়। আসলে একদম ভালো লাগছিল না, তাই চলে এলুম তোমার কাছে।

—বেশ করেছিস। তা হলে আজ থেকে যা এখানে। বলে আসছি ঠাকুরকে।

—না মামা, থাকবার জো নেই আজ। অনেকগুলো কাজ ফেলে এসেছি, সকালেই সেরে রাখতে হবে সে সব! একটু পরেই ফিরতে হবে আমাকে।

—রাস্তায় যা ট্রাফিক আর সন্ধ্যের পরে যে রকম লরীর উৎপাত শুরু হয়—

—আমার জন্যে ভেবোনা মামা।—শোভন হাসল: অর্ধেক ভারতবর্ষ আমি স্কুটারে করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

—হয়েছে, আর বাহাদুরী করতে হবে না। কি খাবি এখন? চা?

—চা তো খাবই, আর সেই সঙ্গে তোমার মুড়ি আর তেলে ভাজা। যাই বলো মামা, পশ্চিমের তেলে ভাজা অবিশ্যি খুবই ভালো, কিন্তু বাংলা দেশের মুড়ির সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

—আনাচ্ছি—

মামা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বারান্দায় গিয়ে তারস্বরে হাঁক ছাড়লেন: জনার্দন—জনার্দন—

সাড়া দিয়ে মেসের চাকর জনার্দন এল। তাকে পয়সা দিয়ে মামা স্টোভের দিকে এগোলেন।

—সরো সরো মামা—শোভন লাফিয়ে এগিয়ে গেল: আমিই চা করছি।

কেট্‌লি পরিষ্কার ছিল, কুঁজোয় জল ছিল। শোভন চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে আবার বিছানায় এসে বসল।

—তোর ব্যবসা কেমন চলছে রে ?—মামা জানতে চাইলেন।

—ভালোই।—শোভনের গলায় অভিমান ফুটে বেরুল : কিন্তু এই ছমাসের ভেতর তুমি একদিন গেলে না পর্যন্ত।

—কী করে যাই বল ? এক একটা রবিবার বেরিয়ে পড়ব ভাবি, কিন্তু—অসহায়ভাবে মামা বলে চললেন, ঠিক কোত্থেকে একদল ছাত্র-ছাত্রী এসে হাজির হয়। আর এসে যখন পড়েই, তখন একটু না দেখিয়ে দিলে কি চলে ?

—পয়সা দেয় ?

—আরে না-না ! পয়সা-টয়সা—বাজে, ওসব কোশ্চেন ওঠেই না। কারণ আমিই নিই না। হাজার হোক আমার নিজের স্টুডেন্ট্ —দিতেও পারে না—

—খুব পারে মামা, ব পারে।—শোভন উত্তেজিত হয়ে উঠল : তোমার এই কলকাতায় কফি হাউসেই এদের যে আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখি আর এরা যেভাবে এত দামের সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়, তাতে এদের তো গরীব বলে ভুল হয় না।

মামা হাসলেন : না-রে সবাই না। এক একজন ছেলে মেয়ে যে কী কষ্টে লেখাপড়া করে শুনলে তোর চোখে জল আসবে।

—সব তোমার বানিয়ে বলা মামা। তোমাকে ভাল মানুষ দেখে এক্সপ্লয়েট্ করে। এবার এলে স্রেফ্ তাড়িয়ে দেবে। আর তোমার যদি চক্ষুলজ্জায় বাধে আমাকে বলো, এক এক রবিবার এসে আমি দরোয়ান হয়ে দাঁড়াব, হিন্দীমতে কিভাবে লোক তাড়াতে হয় সে দেখিয়ে দেব তোমাকে।

মামা তেমনি মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন, জবাব দিলেন না। মুড়ি আর তেলে ভাজার ঠোঙা ধরে নিয়ে ঢুকল জনার্দন, দুটো প্লেটে করে সাজিয়ে, দু জনের মাঝখানে একটা টিপয় এনে তার ওপর রাখল।

কেট্‌লিতে আওয়াজ উঠেছিল। জনার্দন বললে, চা-টা করে দেব বাবু ?

—দে।

মামা-ভাগ্নেতে মুড়ি আর তেলেভাজা চলতে লাগল।

—আচ্ছা শোভন!

—হুঁ।

—গ্রামের লোকে আর গোলমাল করেনাতো কোনোরকম?

—না।—হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন। মেনে নিয়েছে আমাকে।

—তুই আলাপ করে নিয়েছিস তো সকলের সঙ্গে?

—আমি করিনি। গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে গেছেন দু-চারজন। চাঁদা-টাঁদাও তো চাইতে হয়।—শোভনের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল: আচ্ছা মামা, শ্রীধর চাটার্জির সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?

—না।—বেগুনী চিবুতে চিবুতে ভরা মুখে মামা বললেন।

—ঘোষদীঘির লোক? রিটায়ার্ড বি-সি-এস? ক্রীশ্চান?

—ঘোষদীঘিরই নাম শুনিনি কখনো। কেন রে?

একটু চুপ করে থেকে শোভন বললে, পরে বলব।

জনার্দন চায়ের পেয়ালা এনে রাখল। বললে, আর কোনো দরকার আছে?

—কিছু না। যা তুই।

চায়ে চুমুক দিয়ে শোভন বললে, সত্যি, কবে যাবে বলো। একেই তো তোমার বাংলা দেশে আমি পরদেশী—তার ওপর ওই পাড়া গাঁ। কী যে একা একা লাগে কী বলব তোমাকে। কলকাতা হলে তবু বা কথা ছিল, যেন নির্বাসনে পাঠিয়েছ আমাকে।

মামা কিছু একটা ভাবছিলেন। বললেন, হুঃ।

—হুঁ কী? কবে যাবে?

মামা জবাব দিলেন না কথাটার। তার বদলে বললেন, খুব একা একা লাগে—নারে?

—লাগেই তো। ডিমের হিসেব করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। একদিন তো স্বপ্নই দেখলুম, আমার হাত-পা নাক-মুখ,

কিছুই নেই, আমিও একটা বিরাট ডিম হয়ে গেছি আর আমার গায়ে প্রকাণ্ড একটা লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে—তাতে লেখা, কম্পিটিশন এগ্—নাম্বার ফাইভ থাউজ্যাণ্ড্ ফাইভ হানড্রেড্ ফিফ্‌টি ফাইভ।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মামা, এক ঝলক চা উছলে উঠল পেয়ালা থেকে। হাসি থামলে বললেন, মিথ্যে কথা—বানিয়ে বানিয়ে বলছিস এ-সব।

—না মামা, খোদার কসম।

—থাম্ তুই, খোদার কসম।—কোঁচার খুঁটে মুখের কোনা মুছে নিয়ে মামা বললেন, এইবার আমার যা কাজ সে আমি বুঝতে পারছি। তোর একটা বিয়ে দিতে হবে।

—বিয়ে!—শোভন বিষম খেলো।

—হ্যাঁ, বিয়ে। বৌমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারলে আর একা একা ঠেকবে না—হা-হা!

দার্শনিক মামা ভাগ্নের উদ্দেশ্যে রসিকতাটুকু করে পরমানন্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু রাঙা হয়ে উঠল শোভনের মুখ।

মামা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বাজল। বেশ লঘু ছন্দিত আওয়াজ। মামা বললেন, কে যেন আসছে।

—নিশ্চয় তোমার কোন হতভাগা ছাত্র। আসবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে তাড়া না করেছি তো আমি—

মুখের কথা মুখেই রইল। একটি মিষ্টি সুরেলা গলার ঝঙ্কার উঠল দোরগোড়ায়: আসব স্যার?

মামার মুখ দরজার দিকে ফেরানোই ছিল, হেসে বললেন, এসো চিত্রা।—আর শোভন ঘাড় ফিরিয়েই একটা লাল শাড়ীর ঝলক দেখে মাথা নামিয়ে নিল।

মামা বললেন, চিত্রা, এ আমার ভাগ্নে শোভন ব্যানার্জি। এর

কথা তো আগেই বলেছি তোমায়। আর এ হল চিত্রা কুণ্ডু—আমার ছাত্রী, ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়েই শোভনের চোখ চিত্রার মুখে আটকে গেল। সেই মেয়েটি। বাঁ গালে সেই বড়ো কালো জড়ুলটি, চোখে সেই ফিকে নীল কাচের চশমার ওপর ঘরের হলুদ আলোটা জ্বলছে।

শোভন বলে ফেলল : আপনি!

চিত্রা হাসল : পৃথিবীটা যে গোল সেটা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল শোভন বাবু।

সব চাইতে চমকে উঠলেন মামা : সেকি অলাপ ছিল নাকি?

চিত্রা বললে, না স্যার—ঠিক আলাপ ছিল না। এখন সাড়ে ছ'টা—ঠিক সওয়া ঘণ্টা আগে রাস্তায় উনি আমাদের একটুখানি বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

—কি রকম?

ঘটনাটা এত ছোট যে তার অস্তিত্বও মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল শোভনের। আজই কলকাতা আসবার পথে একটা ফাঁকা মাঠের মতো জায়গায় একটি গাড়ীকে বিপন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে। গাড়ীর ভেতরে বসে ছিল এই মেয়েটি আর বাইরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বনেট খুলে কী সব টানাটানি করছিলেন।

শোভন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এ-ভদ্রতাটুকু সবাই করে।

'আমি গাড়ীর কাজ জানি। কিছু সাহায্য করতে পারি কি?'

ভদ্রলোক অসহায়ভাবে বললেন, 'স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। কী যে হল বুঝতে পারছি না।'

'তেল ঠিক আছে?'

'একটু আগেই দিয়েছি। পনেরো লিটার।'

শোভন জবাব দিয়েছিল, 'আমি একবার দেখতে পারি?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'দেখুন না—দেখুন না।'

এইবার গাড়ী থেকে নেমে এসেছিল মেয়েটি। হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ—সেই কথাই ভালো। দেখুন, বাবা কোনমতে চালাতে পারেন এই মাত্র—গাড়ীর কিছুই জানেন না। ড্রাইভারের অসুখ বলে আজ নিজেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তুমি সরে এসো বাবা—এটা সেটা টানাটানি করে আরো বিগড়ে দেবে।'

শোভন এইবার ভালো করে চেয়ে দেখেছিল মেয়েটির দিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে নীলচে চশমার কাচ যেন জলের ওপর আলো-বিন্দু। বাঁ গালে একটা কালো বড়ো জড়ুল মুখখানাকে বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তারপর গাড়ীর দিকে মন দিয়েছিল সে।

অভ্যস্ত চোখে দু-মিনিটেই ধরা পড়ল। এক টুকরো কার্বনের মুখে কী যেন ময়লা জমেছিল, সামান্য ঘসে মেজে দিতেই ঠিক হয়ে গেল।

'নিন, স্টার্ট দিন গাড়ী।'

লক্ষ্মীছেলের মতোই গাড়ী স্টার্ট নিয়েছিল।

ভদ্রলোক এবং মেয়েটি একসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন: 'আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন—'

'কিছু না—কিছু না। আচ্ছা—নমস্কার—'

'নমস্কার—'

এই ছোট ইতিহাসটুকুই সংক্ষেপে জানাতে হল মামাকে। মামা হাসলেন।

চিত্রা বললে, আমি কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা এক্‌স্‌পেক্‌ট করেছিলুম স্যার। রাস্তায় ওঁর লাল স্কুটারটা দেখেছিলুম—আর সেই নম্বর।

—বেশ, ভালো করে আলাপ করো এবার। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে কেন চিত্রা? বোসো।

বসবার আর দ্বতীয় জায়গা নেই, বিছানায় শোভনের পাশেই চিত্রা অসংকোচে বসে পড়ল। সামান্য একটু সরে গেল শোভন।

চিত্রা বলল,' আজকে তা হলে পড়া থাক স্যার, আপনাদের আর ডিস্টার্ব করবনা। আমি বরং আর একদিন—

এবার শোভনই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—না মামা, আমিই যাব এবার।

চিত্রা কুণ্ঠিত হল : সে কি, আমি এলুম বলে চলে যাচ্ছেন নাকি! না—না শোভনবাবু, আপনি বসুন। স্যারের ওপর উপদ্রব তো আমরা সব সময়েই করি, আমিই না হয় পরে—

শোভন হাসল : না, সেজন্যে নয়। এখন সাতটা বাজে—একটু পরেই দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে আমার। তারপরে আবার পাড়ি দিতে হবে বিশ মাইল রাস্তা। আমি আসি—নমস্কার।

—থেকে গেলে পারতিস আজকে—আর একবার মামার অনুরোধ শোনা গেল।

—বললুম তো তোমায়, কাল সকালে বিস্তর কাজ আছে হাতে। চলি—

শোভন বেরিয়ে এল।

আরো ঘণ্টা তিনেক পরে, লরী, বাস, মোটরের পাশ কাটিয়ে চলতে, কখনো খোলা মাঠ, কখনো বা গাছপালার ঠাণ্ডা ছায়ার বোরের দিয়ে চলতে চলতে বাঁ গালের ওপর বড়ো কালো জড়ুল সেই মেয়েটি বার বার ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

এক ছবি থেকে আর এক ছবি।

সেই আগ্রার গ্রাম। ও-দেশী এক বন্ধুর বিয়ে। শোভন 'বরিয়াত' গিয়েছিল।

বিয়ের আসরে এখনো বাঈজীর নাচ গান গ্রাম অঞ্চলে অপরিহার্য আভিজাত্য ও দেশে। মধ্যবয়সী সুদর্শনা মেয়েটি আসরের মাঝখানে কী ভেবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শোভনের সামনে।

'আভিতক্ শাদী নেহি কিয়া বাবু সাহাব?'

'নেহি।'

'অ্যায়সা খুবসুরত্ নৌজোয়ান হেঁ আপ—কোই মেহবুবা নেহি আয়ী?'

লাল হয়ে উঠে শোভন বলেছিল, 'নেহি।'

আসরে হাসির রোল উঠেছিল।

'সচ্?'

'সচ্'—এতক্ষণে অপ্রতিভ হয়ে শোভন জবাব দিয়েছিল: 'আপ মিলা দেউগী?'

উত্তরে গান গেয়ে উঠেছিল বাঈজী। তার মূল কথা হল: এতদিন কেন দেরী করলে মুসাফির? আমি তো তোমারি আশায় 'রাহ্‌পর' চেয়ে বসেছিলুম, তুমি এলে না—মাঝপথ থেকে এক দিওয়ানা এসে আমার দিল ভিক্ষে চেয়ে নিলে। এখন আর তোমায় কী দেব।

'শাবাস—শাবাস!'

আবার অট্টহাসি ভেঙে পড়েছিল সভায়। আর শোভন বলেছিল, ভদ্রে
'আপনি (য়েই ফেলেছ, তখন তো কিছু আর করবার নেই। আমি
ার কারো জন্যেই অপেক্ষা করব। মঁ্যয় ইন্তজার কর রহুঙ্গা। .
'রি
মঁ্যয় ইন্তজার কর রহুঙ্গা।

ক আসবে শোভন জানে না। চলতি স্কুটারে হাওয়ার আঁজলা এসে মুখে চোখে আছড়ে পড়তে লাগল, ইলেকট্রিকহীন অন্ধকার পথে বার বার মনে জেগে উঠতে লাগল কোথায় যেন পড়া উর্দু শাএরের দুটি লাইন:

"মেরী জিন্দগী আন্ধেরে মেঁ ভড়ক রহি থি লেকিন
মেরে সাথ্ তুম আকর মেরী রাহ্ কর দী রোশন—"

অন্ধকারে আমার জীবন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এসে পথ আলো করে দিলে।

চার

অশ্বিনী হালদার ঠিকই বলেছিল, চিনে নিতে কষ্ট হল না।

বড়ো রাস্তা থেকে বাঁ দিকে যে পথটা বেরিয়ে গেছে, সেখান থেকে আরো আধ মাইল এগিয়ে ঘোষ দীঘি, সব শুদ্ধ মাইল তিনেকের বেশি নয়। দূর থেকেই রাইস মিল চোখে পড়ল। বাঁধানো অনেকটা জায়গা জুড়ে ধান শুকোচ্ছে—কাক আর চড়ুইয়ের মেলা বসেছে সেখানে। এক জায়গায় খালি লরী দাঁড়িয়ে আছে একটা। লম্বা টিনের শেডের মাথায় কালো চিমনি। আজ রবিবার বলে কাজ বন্ধ, চিমনির মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে না। গেটের উপরে বড়ো সাদা হরফে পড়া যাচ্ছে: 'জয়তারা রাইস মিলস্।'

শোভন ভ্রূকুটি করল। জয়তারা! ক্রীশ্চান শ্রীধর চাটুজ্জে রাইস মিলের এমন হিন্দু পৌত্তলিক নাম রাখবেন! জায়গাটা ভুল হল নাকি? তাতো নয়—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রোপ্রাইটার এস্ চ্যাটার্জি!

রাইস মিল তো পাওয়া গেল—বাড়ী কোন দিকে? রবিবারের বেলা এগারোটায় চারদিকে শান্ত নির্জনতা। রাস্তার এ-পারে একটু দূরে একজন ক্ষেতের মধ্যে কী যেন কাজ করছে, ওকেই ডাকবে নাকি একবার?

তার আর দরকার হল না। কোত্থেকে গোল করে পাকানো সেই ছাতাটা হাতে নিয়েই ছুটে এল অশ্বিনী হালদার।

—আসুন, আসুন—এদিকে-এদিকে—

রাইস মিলের পাশ দিয়ে—একটা ছোট জলা বাঁয়ে রেখে, একটু এগিয়ে বাড়ী। নতুন ধরনের শৌখিন দোতলা, সামনে বাগান, কতগুলো বুগেনভিলিয়ায় রঙের বাহার। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত

লাল সুরকির পথ। দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল একজন—মস্ত সেলাম করে গেট খুলে দিলে।

অশ্বিনী বললেন, বাবু কোথায় ?

—বসবার ঘরে।

—আমার সঙ্গে আসুন স্যার। এই এ দিকে। হ্যাঁ—হ্যাঁ। মোটর বাইকটা এখানেই থাক। এই জামগাছের নীচে।

স্কুটার রেখে বারান্দায় উঠল শোভন। চকচকে কালো মেজে থেকে—কালো কালো গোল থাম—যেন গ্রানিট পাথরে তৈরী। ঢুকতেই বারান্দার দেওয়ালে একখানা রঙিন ছবি চোখে পড়ল। খ্রীস্ট দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় তাঁর জ্যোতির মুকুট। তাঁর পায়ের কাছে ভারতীয়, চীনা, নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান, আরব, ইয়োরোপীয়—সব জাতের মানুষ নতজানু হয়ে বসেছে—খ্রীস্ট আশীর্বাদ করছেন হাত বাড়িয়ে। শ্রীধর চ্যাটার্জি যেন সজোরে ঘোষণা করছেন, এ এক নিষ্ঠাবান ক্রীশ্চানের বাড়ী।

ওঁর বাপের আমলে—সেই চটি আর চাদর পরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যুগে কি রকম ছিল, এই বাড়ীর চেহারা ? ভাবতে চেষ্টা করল শোভন।

বোধ হয় মিনিট দেড়েক সময় কেটেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই কটা কথা ভাববার ভেতরে। এর মধ্যে ডান পাশের একটা ঘরের মোটা সবুজ পর্দাটা সরিয়ে অশ্বিনী ডাকলেন : আসুন স্যার—

শোভন ঘরে ঢুকল। আর ডিভান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একজন স্থূলকায় বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিলেন শোভনের দিকে : কাম—কাম—মাই ডিয়ার বয়, হাউ ডু ইউ ডু ?

—হাউ ডু ইউ ডু ?—প্রতিধ্বনি করে করমর্দন পালা সাঙ্গ করতে হল শোভনকে। মনে মনে ভেবেছিল, পিতৃ বন্ধু যখন একটা প্রণাম তাঁকে করতে হবে তার। কিন্তু শ্রীধর চাটুজ্জে নিজেই সে পাট মিটিয়ে দিলেন।

—দাঁড়িয়ে কেন? বোসো-বোসো। বী কম্‌ফরটেবল্!

যাক, ভদ্রলোক তা হলে বাংলা জানেন, বলতেও পারেন। আরো কিছুক্ষণ টানা ইংরেজী চালালে শোভনকে দিল্লীর চোস্ত উর্দুর আশ্রয় নিতে হত।

সামনের ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসল শোভন। একটি শহুরে ড্রয়িং রুমে যা-যা থাকা দরকার সব আছে। লাফিং ওল্‌ডম্যান, অদ্ভুত চেহারার স্পঞ্জ, টিপয়ের ওপব পোর্সিলেনেব ভাস পর্যন্ত রয়েছে আর তাতে লম্বা লম্বা ডোবাওলা পাতা মেলেছে কী একটা নিরীহ ক্যাকটাস।

দেওয়ালে খ্রীস্ট ঠিক আছেন। ও-পাশের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো তেলরঙেব বিরাট আর একখানি ছবি—একটি কালো সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলে ভবা গাছে হেলান দিয়ে, সামনে পাহাড়ী নদী, ওপাবে দূবে পাথবে বসে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে কে এক কিশোর। পুরো রোমান্টিক ছবি—খ্রীস্টেব পাশে যেন একান্ত বেমানান।

কিন্তু শোভন চমকালো অন্য কারণে। লাল রঙেব সইটা জ্বল জ্বল করছে। এস, ব্যানার্জি। তার বাবার আঁকা ছবি।

শ্রীধর চাটুজ্জে কথা কইলেন।

—ডু ইয়ু স্মোক?

একটা সিগাবেটেব টিন এগিয়ে দিলেন সামনে। লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল শোভন: না।

—না কি হে? অভ্যেস থাকে তো নাও। ও সব বাজে সেন্টিমেণ্ট আমার নেই। রেসপেক্টটা সম্পূর্ণ মনের জিনিস—ইট হ্যাজ গট্ নাথিং টু ডু উইথ এ স্মোক। নাও—নাও—

চক্ষু লজ্জার কোন অর্থ হয় না আর। অগত্যা জবাব দিতে হল, মমি দুটো একটা সিগার—

—দ্যাট্‌স্ অলরাইট—টিনটা সরিয়ে নিয়ে শ্রীধর বললেন, মানে

কড়া জিনিসের ভক্ত। তা হলে সিগারেট তো তোমার ভালো লাগবে না। বী হ্যাপি উইথ ইয়োর ও-ন্ ব্র্যাণ্ড।

—এখন থাক।—শোভন এড়িয়ে গেল। শ্রীধর চ্যাটার্জি যতই সংস্কারমুক্ত হোন, একজন বুড়ো মানুষের মুখের সামনে আধ হাত লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে নিতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকল তার।

শ্রীধর সিগারেট জ্বালালেন, ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে।

—ইউ রিমাইণ্ড মী শৈলেশ—ইন্ হিজ ইয়ঙ্গার ডেজ্। খুব মিল আছে চেহারায়।

ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল শোভনের কপালে। বাপের কথা শোনামাত্র তার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়, একটা কটু আস্বাদে যেন মুখটা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠে। সেই সুন্দর করে সাজানো বাংলো বাড়ীটিতে —সেই হাতের ছোঁয়াচ লাগা বাগানে, দেওয়ালের ছবিগুলোর মধ্যে একজন আর্টিস্ট্কে দেখতে পাওয়া যায়—যে ইম্পার্সোনাল, তার কোনো ব্যক্তি, কোনো সামাজিক রূপ নেই; বইয়ের শেল্ফে ইংরেজী কবিতার দামী সংগ্রহগুলো সেই মনটার আরো বিস্তৃত উদার পরিচয় বয়ে আনে। কিন্তু এস, ব্যানার্জি শৈলেশ্বর কিংবা শৈলেশ হয়ে উঠলেই মা-র নিবিড় চোখ দুটোতে জল ছল ছল করে ওঠে, ফর্সা পিঠের ওপর কালো কালো চাবুকের দাগগুলো লিক লিক করে সাপের মতো, একটা ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যাকে মনে পড়ে—হিংস্র মাতালটা নিজের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে।

শোভন জবাব দিল না। নিজের ঠোঁটটায় দাঁতের একটা চাপ পড়ল কেবল।

শ্রীধর বললেন, একটু চা খাওয়া যাক—কী বলো?

—চা?

—ইট্স্ ইলেভেন নাউ। আরো ঘণ্টা খানেক দেরী হবে বোধ হয় খেতে। তোমার অসুবিধে হবে? তুমি কি তাড়াতাড়ি খাও?

—আজ্ঞে না। বেলা একটা দেড়টার আগে—

—তা হলে এক পেয়ালা চা নিশ্চয় চলতে পারে এখন। শ্রীধর গলা চড়িয়ে ডাকলেন ; অশ্বিনী—অশ্বিনী—

অশ্বিনী হালদার কাছাকাছিই অপেক্ষা করছিলেন কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে পা দিলেন। শোভন অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, অশ্বিনী বাবু শ্রীধরের রাইস মিলের ম্যানেজার, না তাঁর বেয়ারা ?

—কী বলছেন স্যার ?

—দু পেয়ালা চা দিতে বলো অ্যানীকে।

—আচ্ছা স্যার—দ্রুত অদৃশ্য হলেন অশ্বিনী।

অ্যানী। নামটা কানে ঠেকল। শ্রীধর একজন ক্রীশ্চান মহিলাকে বিয়ে করেছেন শুনেছিল, কিন্তু তাঁর নাম কি অ্যানী ? আর তিনি কি তাঁকে অশ্বিনীকে দিয়ে ও-ভাবে ডাকিয়ে পাঠাতে পারেন ? কে জানে ?

—তোমার বিজ্‌নেস কেমন চলছে ?—শ্রীধরের জিজ্ঞাসা।

—ভালোই। একটু বাড়াতে পারলে সুবিধে হত।

—বাড়াও। ওয়েল এ্যাণ্ড গুড্‌। বাট্‌ বিফোর দ্যাট, হোয়াই ডোন্‌-চু গো টু ইয়োরোপ ?

—ইয়োরোপ ?—শোভন চকিত হল।

—সেই কথাই বলছি। শৈলেশকেও বলেছিলুম আমি। বলেছিলুম, এ-সব জিনিস যদি বড়ো করে গড়তেই হয়, তাহলে ইয়োরোপ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা দরকার—মডার্ন পোলট্রি কিভাবে চলছে তার একটা হাতেকলমে অভিজ্ঞতা দরকার। শৈলেশ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তখন ওর শরীরটা ভেঙে পড়েছে অ্যাণ্ড্‌ হি ওয়াজ অ্যালোন। ভেরি অ্যালোন। ওর তখন স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না।

শ্রীধর চুপ করলেন। গলার ভারী মোটা আওয়াজটা একটুখানি ভিজে ভিজে মনে হল, চোখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে এল। মুকুন্দ বাবু আর বলাই দাস বলেছিলেন, শ্রীধর তার বাবার অনেকগুলো টাকা

ঠকিয়ে নিয়েছেন, হয়তো নিয়েছেন, কিন্তু বন্ধুকে ভালোও বাসতেন সে-কথা শোভনের কাছে গোপন রইল না।

শ্রীধর আবার তেমনি ভিজে গলায় বললেন, তুমি হয়তো জানোনা শেষ জীবনে কী ভয়ানক অনুতাপ হয়েছিল শৈলেশের। ড্রিংক করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। হি ওয়াজ ভেরি এ্যাংশাস্ টু গেট ইউ অ্যাণ্ড্ ইয়োর মাদার ব্যাক—কিন্তু ওর সাহস ছিল না। তোমাদের ঠিকানাও ও পেয়েছিল—কে ওকে খবর দিয়েছিল মিসেস ব্যানার্জি আগ্রার একটা স্কুলে চাকরি করছেন। বছর চারেক আগে আমি যখন রিটায়ার করে গ্রামে আসি, তখন দেখেছিলুম, কী যন্ত্রণায় ও রাতদিন জ্বলছে। আমি ওকে বলেছিলুম, চলে যাও আগ্রায়, নিয়ে এসো ওদের—বিলেত পাঠাও ছেলেকে, ট্রেনিং দিয়ে আনাও—লিড্ এ নিউ লাইফ। কিন্তু সাহস পায়নি। বলেছিলুম, তোমার যদি নার্ভে না কুলোয়, আমি যাচ্ছি। জবাব দিয়েছিল, না—দরকার নেই। ইন্দ্রাণীর সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

শ্রীধর থামলেন। মৃদু বিষণ্ণতা ছড়িয়ে গেল ঘরময়। বাইরে থেকে পাপিয়ার ডাক আসতে লাগল, জানলা দিয়ে চোখে পড়তে লাগল বাগানের ঘন সবুজের ভেতর এক মুঠো বুগেনভিলিয়ার উচ্ছ্বসিত রক্তিমা। রবিবারের শান্ত স্তব্ধতা এই ঘরটার ছায়ার ভেতর করুণ হয়ে ঘনিয়ে রইল। আর শোভন যেন নতুন করে শুনল তার মায়ের নাম—ইন্দ্রাণী। চোখের সামনে এই ছবিটা ফুটে উঠল —তার কিশোরী মায়ের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় উজ্জ্বল পুরুষ—তার বাপ শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তার পরের অংশটুকু বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণায় কুটিল—এই মুহূর্তে শ্রীধর চাটুজ্জের আত্মমগ্ন গভীর গলার স্বরে সেই অধ্যায়টা পার হয়ে আর একজন মানুষকে দেখতে পেল শোভন। ক্লান্ত, অনুতপ্ত। নিঃসঙ্গ নিরন্ত দিনগুলো। নিজের আঁকা ছবির ভেতরই হয়তো মুক্তি খুঁজছে সে। পাচ্ছে কি?

শ্রীধর গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন একবার। বললেন, আমার মনে হয়, একবার তোমার ইয়োরোপে ঘুরে আসা উচিত। অবশ্যি এক্ষুনি নয়—চারদিকটা খানিক গুছিয়ে নাও, তারপর। বাইরে ট্রেনিং হলে—ইকুয়িপ্‌মেণ্টস্‌ থাকলে ব্যবসা ভালোও হবে—বাড়াতেও পারবে।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।

শ্রীধব আবার চুপ করলেন, পুরু শেলের চশমার ভেতর দিয়ে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে। মিনিটখানেক নিঃশব্দে লক্ষ্য করলেন তাকে, তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক শৈলেশের চেহারা। ইন্‌ হিজ ইয়ঙ্গার ডেজ। তবে শৈলেশের কম্‌প্লেক্‌শন ছিল র‍্যাদার ডার্ক—তুমি তোমার মা-ব উজ্জ্বল রং-টাই পেয়েছ।

মা! শোভন সেন্টিমেণ্টাল্‌ নয়, কিন্তু মার কথা মনে হলেই একটা কান্নার ঢেউ উঠে তার গলার কাছে কাঁপতে থাকে। তখন তার আর কাউকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয় না, এমনকি পিতৃবন্ধু শ্রীধর চ্যাটার্জির ওপরেও একটি তীক্ষ্ণ ঘৃণা এসে উছলে পড়ে। শোভন চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণের ক্যাক্‌টাস্‌টার দিকে চেয়ে রইল।

—চা এনেছি।

একটি শান্ত মেয়েলি গলার স্বর। শোভন দরজার দিকে তাকালো।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে। শ্যামবর্ণ লম্বা চেহারা। পরনে কালো পাড়ের সাদা শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে দু গাছা করে সোনার চুড়ি।

শ্রীধর বললেন, চা-টা এখানে রাখো অ্যানী, এই টেবিলে।

এ-ই তাহলে অ্যানী! এই কুড়ি একুশ বছরের মেয়েটি মিসেস চ্যাটার্জি নয় নিশ্চয়ই।

অ্যানী ট্রে রেখে চলে যাচ্ছিল, রূঢ় গলায় পেছন থেকে তাকে ডেকে উঠলেন শ্রীধর।

—যাচ্ছ কোথায়? চা-টা তৈরী করে দিয়ে যাও।

শ্রীধরের এতক্ষণের স্নেহভরা মার্জিত কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন বেসুরো বাজল। নিঃশব্দে টি-পট থেকে অ্যানী পেয়ালায় চা ঢালল। একবার চোখ তুলে প্রায় নিঃশব্দ গলায় শোভনকে জিজ্ঞেস করলে, ক' চামচ চিনি আপনার?

—দু চামচ হলেই যথেষ্ট। ধন্যবাদ।

মেয়েটির কালো কালো শীর্ণ আঙুলগুলো চামচে দিয়ে চা নেড়ে চলেছে—মৃদু শব্দ উঠছে টিন-টিন। শ্রীধর আবার ভুরু কোঁচকালেন।

—এতদিনেও ম্যানার্স শিখলে না অ্যানী। কতবার বলেছি, পেয়ালায় কখনো চামচের আওয়াজ করবে না। কিছুই কি তোমার মনে থাকে না?

লম্বা মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে চা তৈরী করছিল, তার মাথাটা যেন নুয়ে পড়ল আরো খানিকটা। শোভন লক্ষ্য করল তার চোখের পাতা দুটো অল্প অল্প করে কাঁপছে, একটুখানি রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে শ্যামলা গালের ওপর। বাইরের একজন অচেনা লোকের সামনে এখন এই শাসনটুকু না করলে কী ক্ষতি হত শ্রীধরের? একেবারেই ভালো লাগল না।

চা দিয়ে অ্যানী বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই শ্রীধর আবার ডাকলেন: রান্নার কত দেরী?

—বেশি নয়।

মোটা কবজীতে বড়ো গোল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন শ্রীধর। বললেন, এখন ঠিক সাড়ে এগারোটা। ঠিক সাড়ে বারোটার মধ্যে যেন রেডি হয়ে যায়, বুঝেছ?

—আচ্ছা।

শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে চলে গেল আবার। শোভনের মনে হল, আশ্চর্য ছায়ার মতো চলা ফেরা করে অ্যানী, ওর পায়ে কোন শব্দ হয় না।

—নাও হে, চা খাও। এই যে বিস্কিট।

—মাপ করবেন, বিস্কুট দরকার নেই। শুধু চা হলেই চলবে।

দুজনেই চায়ে চুমুক দিলেন। শ্রীধর বললেন, কিহে, চা ঠিক আছে তো? মানে অ্যানীর ওপর ঠিক ডিপেণ্ড করা যায় না তো—মেয়েটা এত ক্যাড্ যে—

—আজ্ঞে না, চা ঠিক আছে আমার।

কিন্তু মেয়েটা ক্যাড্ কেন? দেখতে রূপসী নয় বলে? তাছাড়া শোভনের তো এমন কিছু অস্বাভাবিক বোধ হল না। অ্যানীর কালো নিবিড় চোখদুটো, তার গালে এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়া, সব মিলে—

শোভন বললে, অ্যানী বুঝি আপনার কুক?

—কুক?—একটু যেন তাকালেন শ্রীধর: হ্যাঁ-না, মানে—হ্যাঁ কুকই বলতে পারো। আসলে অরফ্যান, আমি আশ্রয় দিয়েছি। বাড়ীর সব ওই দেখাশোনা করে—আমি উইডোয়ার, ইউ নো। আমার ছেলে ইণ্ডিয়ান এম্ব্যাসিতে চাকরি করে জাপানে। মেয়ে পাঞ্জাবে স্বামীর ঘর করছে। বুঝতেই পারো, বাড়ীঘর দেখাশোনার জন্যে কেউ না থাকলে—নাউ—অ্যাট্ দিস এজ—

—সে তো ঠিক কথা।

তারপর নানা গল্প চলল। চাকরি জীবনের কথা—যত জায়গায় ঘুরেছেন, যত এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তার কথা। মাঝে মাঝে শৈলেশ ব্যানার্জির আলোচনাও টেনে আনলেন। প্রথম জীবনে—কী বলে—একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ইউ নো—হি ওয়াজ নেভার—নেভার হ্যাপি!—শেষের দিকে ওর মনে কী যে অনুতাপ এসেছিল সে আমি জানি।

অনুতাপ এসেছিল হয়তো। নইলে সেই চিঠিখানা কেনই বা লিখলেন শোভনকে—কেনই বা সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে যাবেন ওর নামে! কিন্তু মা—

সত্যিকারের আর্টিস্ট্ ছিল লোকটা। ইয়োর অবন ঠাকুর একবার

ওর একখানা কাজ দেখে বলেছিলেন, এ ছেলেটি খাঁটি সোনা। জানো, ওর ভারী স্বপ্ন ছিল কিছুদিন গিয়ে পারীতে বাস করবে—ছবি আঁকা শিখবে সেখানে। সেই পারীই তো আর্টিস্টদের প্যারাডাইস। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারল না। এক একটা মানুষ কী অভিশাপ নিয়েই জন্মায় সংসারে!

শ্রীধরের কাছে এসে অন্তত একটা লাভ হয়েছে—এটা সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শোভন ভাবছিল। যে জমাট অন্ধকার দিয়ে শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা কদাকার বিকৃত মূর্তি সে গড়ে নিয়েছিল, তার ওপর যেন একটুখানি আলো পড়েছে এসে। বাপের লেখা সেই চিঠিখানার কয়েকটা লাইন যেন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে: 'আমাকে তুমি শ্রদ্ধা কোরো না, করবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমার দিক থেকে সত্যিই আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার মা আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগ না দিয়েই চলে গেছে, কিন্তু—'

দরজার পর্দা নিঃশব্দে সরে গেল। অ্যানী। সেই ছায়ার মতো মেয়েটি। চলবার সময় যার পায়ে এতটুকুও শব্দ হয় না।

—খাবার তৈরী।

ঘরের ক্লক্‌টায় ঢং করে সাড়ে বারোটা বাজল।

পাঁচ

ফিরে আসতে প্রায় চারটে পেরিয়ে গেল। প্রায়ই আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে মুক্তি।

শ্রীধরের গল্প আর শেষ হয় না। শোভনকে দেখে তিনি যে কত খুশি হয়েছেন এবং বাপের চেহারার সঙ্গে তার কী যে আশ্চর্য মিল, বার বার বলেও তা ফুরোতে পারেন না তিনি। একটা ভালো পোল্‌ট্রি আর ডেয়ারী এক সঙ্গে চালাতে পারলে তা থেকে যে কী পরিমাণ লাভ হওয়া সম্ভব, তারও নিখুঁত হিসেব যেন তাঁর নখদর্পণে। এত জেনেও শ্রীধর পোল্‌ট্রি আর ডেয়ারী ফার্ম না করে কেন রাইস মিল করতে গেলেন, সেইটেই শোভন ভেবে পেল না।

খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন প্রচুর। বিলিতী কেতার স্যুপ্‌ থেকে দিশী রীতির পায়েস পর্যন্ত কোনো আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। মাঝে মাঝে এক আধটু সমালোচনা করেছিলেন শ্রীধর, অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন অ্যানীর দিকে, নির্বাকপ্রায় মেয়েটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিচ্ছিল ডিশগুলো।

এক সময় শোভনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যাচ্ছিল। একবার বলেই ফেলেছিল, রান্না তো খুব ভালো হ য়ছে কাকাবাবু।

—তুমি তো ভালো বলবেই হে—ভদ্রতা তো আছেই একটা। আসলে শী ইজ গুড ফর নাথিং।

ফিরে আসতে শোভনের মনে হচ্ছিল অ্যানী সম্পর্কে কোথাও একটা বিশ্রী বিতৃষ্ণা আছে শ্রীধরের। মেয়েটাকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না, তাই তার প্রত্যেকটা জিনিসের খুঁত ধরা তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এতই যদি অসহ্য হয়ে থাকে, বিদায় করে দিলেই তো পারেন। আশ্রয় যদি দিয়েইছেন, তা হলে প্রত্যেকদিন এইভাবে অপমান করা কেন!

কিন্তু এ-সব ভাবনা শোভনের নয়। শ্রীধর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে যা খুশি করুন, তাঁর 'কুক্'কে তিনি যত ইচ্ছে গঞ্জনা দিন, তা নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই তার। শুধু আসবার সময় চোখে পড়েছিল, সেই কালো লম্বা থামটায় ঠেসান দিয়ে অ্যানী দাঁড়িয়ে। দুটো অন্যমনস্ক চোখ মেলে বুগেনভিলিয়ার রক্ত কুসুম পুঞ্জের ভেতর সে মগ্ন; হঠাৎ মনে হল, শ্রীধরের বসবার ঘরে তার বাবাব আঁকা যে মস্ত বড়ো ছবিখানা রয়েছে, তার সাঁওতাল মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে অ্যানীর।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন শ্রীধর, তারপর বড়ো রাস্তায় রাইস মিল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন অশ্বিনী হালদার। সেই বিনীত চেহারা, হাতে সেই গোল করে পাকানো পুরোনো ছাতাটি।

স্কুটারে ওঠবার আগে হঠাৎ কী একটা কথা মনে এল শোভনের।

—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো অশ্বিনী বাবু?

অশ্বিনী হাসলেন: হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে বলতে হবে না। খুব যত্ন করে খাইয়েছে অনীতা মা।

—অনীতা মা?—শোভন একটু আশ্চর্য হল: অ্যানী?

—হ্যাঁ, ওর নামই অনীতা। সাহেব আবার ইংরেজী করে ডাকেন। সত্যি বলছি আপনাকে, বাঙালী মেয়েকে অমন বেয়ারা নামে ডাকাডাকি করা আমার একদম পছন্দ হয় না। মেয়েটি ভালো। শান্ত মিষ্টি স্বভাব, হাতের রান্নাটিও খাসা।

শোভন বললে, রান্নার আপনি তারিফ করলেন, আমারও তো বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু আমি দেখলুম কাকাবাবু তাঁর এই রাঁধুনিটির বান্না একেবারে পছন্দ করেন না। আমার মনে হয়, কলকাতা থেকে ওঁর বাবুর্চি আনিয়ে নেওয়া উচিত।

শেষের কথাটার জবাব দিলেন না অশ্বিনী, তার আগেই বললেন —কী বলছিলেন—রাঁধুনি? কে রাঁধুনি?

—কেন, আপনার ওই অনীতা, যাকে কাকাবাবু আনী বলে ডাকেন।

অশ্বিনীর মুখের রঙ্ যেন বদলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন শোভনের মুখের দিকে।

—সাহেব বললেন আপনাকে? বললেন, অনীতা তাঁর রাঁধুনি?

অশ্বিনীর গলার আওয়াজে শোভন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—ঠিক রাঁধুনি বলেন নি—মানে ওঁর আশ্রিতা, বাড়ীর কাজকর্ম করে—

—ও।

অশ্বিনী চুপ করে গেলেন। শোভন অনুভব করল, এই নিরীহ প্রভুভক্ত লোকটির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল একবারের জন্য, যেন কিসের একটা ছায়া পড়ল তাঁর মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো বার দুই কেঁপে উঠেই থমকে গেল, যেন কী একটা বলবার চেষ্টা করেই অশ্বিনী সামলে নিলেন নিজেকে।

শোভনও আর কথা বাড়ালো না। যার সম্পর্কে তার কোনো দায় নেই, তা নিয়ে কৌতূহল জানানো নিরর্থক। শুধু স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলে, একটা কথা বলব, অশ্বিনী বাবু?

কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এনে কী যেন ভাবছিলেন অশ্বিনী। চমকে বললেন, অ্যাঁ?

—কাকাবাবু তো ক্রীশ্চান! তাঁর রাইস মিলের নামটা এমন পৌত্তলিক কেন?

—ও—ওটা?—অশ্বিনী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ওঁর মায়ের নাম।

বাপের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন তবু মাকে ভোলেনি—শ্রীধর চাটুজ্জে সম্পর্কে এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই স্কুটার ছুটল।

অশ্বিনী পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, নমস্কার স্যার—

পরদিন সকালে চায়ের পাট মিটলে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছিল শোভন। সামনের রাস্তা দিয়ে বাস আর গাড়ীর আনাগোনা, মাঠের ভিজে ভিজে হাওয়ায় এর মধ্যেই মবিলের গন্ধ এসে মিশতে শুরু হয়েছে। তবু বাগানের ফুলগুলো তারই মধ্যে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছিল ; এত বেলাতেও একটু একটু ঝরছিল শিউলির অঞ্জলি। শোভনের মাথার ভেতরে শ্রীধরের ওই কথাগুলোই ঘুরছিল : যাও না ইয়োরোপে, ট্রেনিং নিয়ে এসো—শিখে এসো হাতেকলমে—

ঠিক এই সময় গেটের সামনে ক্রীম রঙের ভারী একটা গাড়ী এসে থামল। হর্নের শব্দ উঠল দু'তিনটে।

কেউ এসেছে এবং তারই এখানে। কিন্তু এত বড়ো গাড়ী করে কে এল ? শ্রীধর ? তাঁর তো গাড়ী নেই, রাইস মিলের জন্যে একখানা লরী আছে কেবল।

সন্দেহের নিরসন হল পরক্ষণেই।

—শোভন—ওরে এই শোভন—

মামার গলা। এক লাফে শোভন বেরিয়ে এল, আর বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

শুধু মামা নয়, আরো দু-জন নেমেছেন গাড়ী থেকে। একজনের স্যুটপরা লম্বা চেহারা, মাথায় ধূসর চুল চিক চিক করছে। দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল শোভন—দু'দিন আগে এঁরই অচল গাড়ী সে চালু করে দিয়েছিল ; আর তাঁর পাশে যার হালকা নীল শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ছে, তার সাদা বাঁ গালের ওপর একটা বড়ো কালো জড়ুল।

চিত্রা কুণ্ডু।

মামা বললেন, কিরে, বোকার মতো চেয়ে রইলি যে ? দেখছিস না, দু-জন গেস্ট পর্যন্ত সঙ্গে করে এনেছি ? নে—ভালো করে আপ্যায়ন-টাপ্যায়ন কর।

ঘোর ভেঙে শোভন সজাগ হয়ে উঠলো।

—আরে কী কাণ্ড! আসুন—আসুন, নমস্কার। এসো মামা—

এগোতে এগোতে মামা বললেন, কি রকম, চমকে দিলুম তো তোকে।

—তা চমকে দিয়েছ বইকি!—শোভন হাসল: শনিবারে যখন গেলুম একটা কথাও তো বললে না তখন। তা ছাড়া একেবারে ওঁদের সঙ্গে করে আনবে ভাবতেই পারিনি।

চিত্রা বললে, খুব বিপদে পড়ে গেলেন তো?

—একেবারে না বলি কী করে! বিনা নোটিশে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়লেন, খালি কষ্টই পাবেন খানিকটা।

—দেখা যাক।

বাগানে ঢুকে সবাই থেমে দাঁড়ালেন। মিস্টার কুণ্ডু, যিনি এতক্ষণ নীরবে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, লাভ্‌লি!

চিত্রার কলোচ্ছ্বাস শোনা গেল: চমৎকার। কি মিষ্টি আপনার বাগানটা শোভন বাবু।

খুশি হতে গিয়েও সম্পূর্ণ হতে পারল না শোভন। এই বাগানটার সঙ্গে আর একজনে স্মৃতি জড়ানো। মানুষটা আর্টিস্ট। কিন্তু শোভন বললে, ভেতরে বসবেন চলুন।

চিত্রা আপত্তি করল: কী হবে ভেতরে বসে। এই তো গাছের ছায়া রয়েছে, বাঁধানো বেদী রয়েছে, চারদিকে ফুল রয়েছে। এইখানেই বসা যাক। বাবা কী বলো?

মিস্টার কুণ্ডু বললেন, খুব ভালো আইডিয়া।

তিন জনেই বসে পড়লেন বেদীতে। মাথার ওপর গাছের ছায়া, হাওয়ায় পাতার শব্দ—ছায়ার জাফরি। বাগানেব একটা নারকেল গাছের মাথায় হলুদ পাখি বাসা করেছে, সেখান থেকে 'বৌ কথা কও' ডাকছিল।

মামা বললেন, আঃ। মীর্জাপুরের মেস থেকে এখানে এসে যেন পুনর্জন্ম হয়।

—তবু তো ওই ঘর থেকে বেরুতে চাও না।—শোভন অতিথিদের দিকে তাকালে : আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি।

ভেতরে গিয়ে মনোহরকে চায়ের ফরমাস দিয়ে, মুরগী তৈরী করতে বলে শোভন যখন ফিরে এল, তখন তিনজনে মিলে ফুল সম্পর্কে উত্তেজিত তর্ক চলছে। দিশী বিলিতী ফুলের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনার ফাঁকে চিত্রা বলছে, যাই বলো বাবা খাঁটি বাংলাদেশের ফুল রজনীগন্ধা—ওর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

অধ্যাপক মামা মাথা নাড়লেন : উঁহু একটু ভুল হল। রজনীগন্ধাও বাংলা দেশের নিজের জিনিস নয়—ওর আদি বাস শুনেছিলুম পারস্যে।

—হোক পারস্যে। ও আমাদেরই হয়ে গেছে।

মৃদু হেসে শোভন সামনের ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

চিত্রা বললে, ওকি—মাটিতে বসলেন কেন ?

—মাটি নয়, ঘাস। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, ঘাসে বসার অভ্যেস আছে, ভালোও লাগে।

—আমাদেরও খারাপ লাগবে না।—চিত্রাও নেমে এল শোভনের কাছে।

—কী করছেন, শাড়ীটা নষ্ট হবে যে।

—আপনার ট্রাউজার যদি অক্ষত থাকে, আমার শাড়ীরও কিছু হবে না। কী বলো বাবা ?

—ঠিক কথা—মিস্টার কুণ্ডু মাথা নাড়লেন। ভদ্রলোকের একটা গুণ আছে, বেশি কথা বলতে পারেন না বলে প্রায়ই মেয়ের সঙ্গে একমত হন আর সেইটেকেই সব চাইতে নিরাপদ বলে মনে করেন। একবার ভাবলেন, নীচে মেয়ের কাছে গিয়েই বসবেন কিনা, কিন্তু ট্রাউজারের মায়ায় শেষ পর্যন্ত সেটা আর সম্ভব হল না।

আবার আলোচনা চলল, ফুল থেকে গার্ডেনিং, গার্ডেনিং থেকে রুচি, রুচি থেকে দিল্লীর বর্ণনা। শোভন একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে নিজের আঙুলে জড়াতে জড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। গমের

ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, ভাঙা মসজিদ আর পীরের দরগার পাশ দিয়ে সেই পথটা। রাত হলে দরগার মিটমিটে চেরাগ, হাওয়ায় পুরোনো সমাধির শ্যাওলার গন্ধ—দূর থেকে গ্রামের ঢোল করতালের সঙ্গে গানের আওয়াজ।

মনোহর এল।

—বাবু, চা দেওয়া হয়েছে।

চিত্রা বললে, চা এখানেই আসুক না।

—না, ভেতরেই চলুন। সামনে রাস্তা, সব সময় গাড়ী ছুটছে, ধুলো এসে পড়বে। আসুন।

সেই বসবার ঘর। দেওয়ালে এস, ব্যানার্জির আঁকা ছবি।

মিস্টার কুণ্ডু ঘরের চার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন। বললেন, অনেক ছবি আছে তো।

চিত্রা বললে, আর ছবিগুলো কি সুন্দর—দেখছ বাবা? সামনের এটা তো ওয়ালটেয়ার—তাই নয়?

—তাই তো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই বটে। ঈস্ট পয়েন্ট থেকে আঁকা। ওই তো ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ। চমৎকার হয়েছে। এপাশে দেখছি মহাবলীপুরম্। লাভ্‌লি! কা'র আঁকা?

শোভন মাথা নামালো—আবার একটা বিস্বাদ অনুভূতি জেগে উঠছে মনের ভেতর। মামার মুখেও ছায়া পড়ল একটুখানি, তিনিই জবাবটা দিলেন।

—শোভনের বাবার আঁকা ও সব।

—খুব ভালো আঁকতেন তো?—চিত্রা শোভনের দিকে তাকালো: আপনিও আঁকতে পারেন নিশ্চয়।

শোভন জোর করে হাসতে চেষ্টা করল: না, ওসব আমার আসে না। নিন—চা খান। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চা চলল, গল্প চলল। কিন্তু এই ঘরে পা দিয়ে, শৈলেশ্বরের অত্যন্ত স্পষ্ট স্মৃতির ভেতরে এসে মামা কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন বার বার।

ছাত্রজীবনের সেই দুর্দিনটা মনে পড়ছে—শোভনের হাত ধরে দিদি এসে পৌঁছেছিল তাঁর মেসে। বলেছিল, কোনো একটা আশ্রম-টাশ্রমের ব্যবস্থা করে দে রজত। আমার যদি জায়গা না-ই হয়, ছেলেটা অন্তত আশ্রয় পাক একটু।

শোভন একবার মামার দিকে চেয়ে দেখল। তাঁর চিন্তার গতি যেন খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল সে।

—আজ বুঝি তোমার কলেজ ছুটি, মামা?

মামা যেন কথা খুঁজে পেলেন।

—আরে তাইতেই তো প্ল্যানটা এল। শনিবারে তুই বেরিয়ে যাওয়ার পরে চিত্রাকে বলেছিলুম, সোমবার ছুটি আছে, একবার শোভনের ওখানে বেরিয়ে এলে হয়। দিব্যি জায়গা, খুব ভালো পোল্ট্রিও করেছে একটা। চিত্রা খুশি হয়ে বললে, চলুন আমিও যাব —বাবাকে টেনে নেব সঙ্গে। বেশ বেড়ানো হবে।

চিত্রা জুড়ে দিলে: আর শোভন বাবুকেও খুব বিব্রত করা হবে।

শোভন হাসল।

—কেউ মাঝে মাঝে বিব্রত করলে তো বাঁচি। একেবারে নির্বাসনে থাকতে হয়।

—বেশি লোভ দেখাবেন না। হানা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলব।

—বেশ তো চেষ্টা করে দেখুন।

মিস্টার কুণ্ডু হাসিমুখে বললেন, সেটা খুব অসম্ভব ব্যাপার হবে না। বিজ্‌নেসের কাজে এ-পথে প্রায়ই আমায় যাওয়া আসা করতে হয়। কখনো কখনো বেড়াতেও যাই এই রাস্তায়। তাইতেই তো আপনার সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

চিত্রা বললে, তুমি কিন্তু সেদিন ভারী অন্যায় করেছিলে বাবা।

সবাই চোখ তুললেন চিত্রার দিকে। বিব্রত হয়ে উঠলেন মিস্টার কুণ্ডু।

—অন্যায়—মানে—আমি—

—অন্যায় ছাড়া কী! তোমার বিপদ দেখে শোভনবাবু গাড়ীটা ঠিক করে দিলেন—চিত্রা একবার আড়চোখে চাইল শোভনের দিকে: কিন্তু একটা শুকনো ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া তুমি আর কিছুই বললে না ওঁকে। ওঁর পরিচয় জানতে চাইলে না, আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে না—

—কী আশ্চর্য, কোনো মানে হয় না—লাল হয়ে প্রতিবাদ করতে গেল শোভন।

—মানে হয় বইকি—লজ্জিত ভাবে মাথা নাড়লেন মিস্টার কুণ্ডু: নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে! কিন্তু চিত্রা, ওটা তো তুমিও করতে পারতে। আমি বুড়ো মানুষ, আমার ভুল হতেই পারে, কিন্তু তুমি—

মামা বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ও নিয়ে আর দুঃখ করে তো লাভ নেই এখন। এরপরে নিমন্ত্রণের পালা দু পক্ষেই চলতে পারবে। চা খাওয়া হয়েছে তো মিস্টার কুণ্ডু? এবার চলুন—শোভনের পোলট্রি দেখে আসা যাক।

চিত্রা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালো: আরে তাই তো ভুলেই গিয়েছিলুম যে আসল কথাটা। চলুন—চলুন—

সবাই এগোলেন পোলট্রির দিকে। মুকুন্দবাবু আর বলাইবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল, আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁরা। মামা কয়েকবার এসে গেছেন—দুজনেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

—ভালো আছেন স্যার?

—চলছে একরম। আপনাদের সব কুশল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে।

মুকুন্দবাবুর সঙ্গে মামাও যখন পরম উৎসাহে ইনকুবেটর তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন মিস্টার কুণ্ডুকে, তখন একটা চুরুট টানবার জন্যে বেরিয়ে এল শোভন। হেনার ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে চুরুট ধরালো, তারপর পুকুরটার দিকে চেয়ে রইল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। নীল জলে হাঁসের ঝাঁক ভাসছে, ঘাটলার আশে পাশে শ্যাওলার ভেতরে কয়েকটা

মাছের ছায়া। একটা মাছরাঙা পুকুরের ঠিক মাঝখানে এসে খানিকক্ষণ যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে রইল—দ্রুত বেগে প্রপেলারের মতো নড়তে লাগল পাখা, তার পরেই সোজা ছোঁ দিয়ে ছোট একটা উজ্জ্বল মাছ তুলে নিয়ে উড়ে বসল শিমুল গাছের ডালে। দিনে দুপুরে ডাকাতি বোধ হয় একেই বলে।

পাশ থেকে চিত্রা বললে, বাঃ—বেশ পালিয়ে এসেছেন তো?

চমকে চুরুটটা আড়াল করতে গিয়েও শোভন সামলে নিলে। দরকার ছিল না। চিত্রা একাই।

—এখানে মামা আমার অভিভাবক। তিনিই আপনাদের দেখাবার-দায়িত্ব নিয়েছেন বলে ফরাসী ছুটি ভোগ করছিলুম একটুখানি। তা ছাড়া চুরুটের নেশাও ছিল—শোভন হাসল: কিন্তু আপনিও দেখছি পালিয়েছেন। মুরগী-তত্ত্ব ভালো লাগল না?

—ভালো লাগবে না কেন, খুব ইণ্টারেস্টিং। খাদ্যতত্ত্ব সবসময়েই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু এত বড়ো পুকুরটা দেখে তার চাইতেও ভালো লাগল। অনেকদিন সাঁতার কেটেছি হেদুয়ায়, ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে।

—পুকুরটা কিন্তু খুব গভীর।

চিত্রা হেসে বললে, আপনি একেবারেই সাঁতার জানেন না—না শোভনবাবু?

—কী করে বুঝলেন?

—তা হলে গভীর জলের ভয় দেখাতেন না। হাঁটু জলে কি কেউ সাঁতার কাটে?

চিত্রার দিকে একবার চেয়ে দেখল শোভন। সুন্দরী কি না বলা শক্ত, কিন্তু উজ্জ্বল ধাবালো শরীর, হাতের পুষ্ট হাড়ে শক্তির চিহ্ন, পাঞ্জাবী মেয়েদের মনে করিয়ে দেয়। চুলের রঙ লালচে, চোখের তারা একটু কটা। বাঁ গালে কালো বড়ো জড়ুলটা অনেক মুখের ভিড়ে একে আলাদা করে রেখেছে।

বড়লোকের সুখী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। বেশ আছে। অকারণেই শোভনের অ্যানীকে মনে পড়ল।

চিত্রা বললে, কী ভাবছেন?

—কিছু না। কিন্তু সত্যিই আপনি স্নান করবেন পুকুরে?

—না, এ যাত্রা নয়। বাবা রাগ করবেন। তাছাড়া আপনার চাকর-বাকর কর্মচারীরাই বা কী ভাববে? ওটা তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্যে। আর যদি আপত্তি না থাকে—আপনাকেও সাঁতার শিখিয়ে দিয়ে যাব।

—সত্যি শেখাবেন?

চিত্রার কটা চোখের তারা দুটো শোভনের মুখের উপর স্থির হয়ে রইল একটুখানি: সত্যি শেখাব।

গলার স্বরটা যেন একটু অন্যরকম কানে ঠেকল। শোভনের মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে কলকাতা থেকে ফেরবার সময় অন্ধকার পথে বার বার স্মৃতিতে ভেসে ওঠা সেই কথাটা: 'মহবুবা? ম্যাঁয় তো ইন্তজার কর রহা হুঁ।'

মামার গলার আওয়াজ কানে এল। ওঁরা এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

ছয়

খাওয়া-দাওয়া হল, গল্পগুজব চলল, চিত্রা গান শোনাল। শোভনের গান জানা নেই, এক প্যাকেট তাস নিয়ে দু-একটা ছোট ম্যাজিকের খেলা দেখাল, খুশির রোল উঠল, মামা আর মিস্টার কুণ্ডু ব্যবসায়-বিমুখ বাঙালী জাতির তীব্র সমালোচনা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বিকেলে ওঁরা চলে গেলেন।

খাওয়ার আগে সেদিনের প্রায়শ্চিত্ত করলেন মিস্টার কুণ্ডু। পরের রবিবার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে গেলেন শোভনকে। বললেন, গাড়ীও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

শোভন হাসল: ত্রিশ মাইল উজিয়ে গাড়ী পাঠানোর দরকার নেই। আমার স্কুটার আছে। তাছাড়া স্কুটার অচল হলে বাস-সার্ভিস তো আছেই।

চিত্রা বললেন, নিশ্চয় আসছেন কিন্তু।

মামা বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওর হয়ে আমিই কথা দিচ্ছি।

গাড়ী চলে গেল। শোভন এসে বসে পড়ল বাগানের বেদীটায়। একটা আশ্চর্য দিন কাটল। এই সাতটা মাসের মধ্যে—নিজেকে নিয়ে এই নিঃসঙ্গতায় কাটানোর একটানা একঘেয়েমির ভেতর হঠাৎ যেন ঘূর্ণি বয়ে গেল। শোভন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বেদীটার নীচে, একফালি ইলেকট্রিকের আলোয় চোখে পড়ল ছোট একটি রুমাল। মেয়েলি জিনিস, নিশ্চয় চিত্রার ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে। শোভন তুলে নিলে রুমালটা, মিষ্টি গন্ধের একটা উচ্ছ্বাস এসে স্পর্শ করল তাকে।

"মেরে জিন্দগী আন্ধেরেমেঁ ভড়ক্ থা, লেকিন—"

রুমালটা ফিরিয়ে দিতে হবে রবিবার। কিংবা—কিংবা—চুরি করে রেখে দিলে কেমন হয়?

ছি—ছি, এসব কী ভাবছে সে! মাত্র তিনটি দিন দেখা হয়েছে চিত্রার সঙ্গে, এর মধ্যে এমন একটা নেশা ঘনিয়ে আসছে কেন? বার বার করে কেন মনে হচ্ছে সেই বাইজীর কথা, কেন ওই উর্দু কবিতাটা অদেখা মৌমাছির মত একটানা গুনগুনিয়ে চলেছে কানের কাছে?

না—একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়।

মামা টের পেলে কী ভাববেন? চিত্রার চোখের দিকে কি তাকানো যাবে আর? মামার ছাত্রী—বড়লোক ব্যবসায়ীর মেয়ে।

এ সব আবোল তাবোল খেয়ালী ভাবনার কী মানে হয়? শোভনের ভুরু কুঁচকে এল। এতক্ষণের রোমান্টিক্ অবেশটা হঠাৎ যেন কেটে গেল তার, নতুন করে মনে পড়ল, শৈলেশ্বরের সম্পত্তির দখল নিতে এসে কী বাধাই এসেছিল গ্রাম থেকে। দূর সম্পর্কের দু-ঘর জ্ঞাতি বলেছিলেন শোভন ব্যানার্জি জাল—শৈলেশ্বরের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। মামলার উদ্যোগ আয়োজনও তাঁরা করেছিলেন, শ্রাদ্ধ বেশি দূর গড়ায়নি। কিন্তু তিন চার মাস উৎপাতের আর অন্ত ছিল না। ঢিল পড়ত, দূর থেকে অশ্লীল গালি-গালাজ আসত, মুরগী-হাঁস চুরি হয়ে যেত, আগুন লাগাবার চেষ্টাও করেছিল একবার।

কিছুদিন ধরে সেটা থেমেছে, কিন্তু ভেতরের চাপা বিষটা এখনো যায়নি। শোভন কারুর সঙ্গে মেশে না, সব কিছু উপেক্ষা করবার জন্যেই ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজকে চিত্রারা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ নিজকে ভারী নিঃসঙ্গ মনে হল তার—যেন চার দিক ঘিরে ঘিরে সেই কুশ্রীতাগুলো আবার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

গোল একটা আলো এসে পড়ল গেটের বাইরে থেকে, সাইকেল থামল কার যেন। শোভন ভুরু কুঁচকে তাকালো সেদিকে।

—আসতে পারি স্যার?

আলো অন্ধকারে আবছাভাবে মানুষটাকে দেখা গেল, চেনাও গেল গলার স্বর। অশ্বিনী হালদার।

—আসুন।

সাইকেল বাইরে রেখে অশ্বিনী ভেতরে ঢুকলেন।

—এত রাত্রে বিরক্ত করলুম নাকি স্যার?

—কিছু না কিছু না। কী খবর?

—দু-একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—ভেতরে আসুন।

বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল শোভন। মনোহরকে ডেকে দু'পেয়ালা চা আনতে বলে দিলে।

তেমনি জড়োসড়ো হয়ে বসলেন অশ্বিনী। বললেন, বোধহয় বড্ড অসময়ে এসে পড়েছি স্যার।

—না, না, মোটে সাড়ে আটটা বেজেছে।

—পাড়াগাঁয়ে তো ন'টার পরেই মাঝরাত্তির, তার ওপর এদিকে সিনেমা টিনেমাও নেই।—অশ্বিনী একটু চুপ করে রইলেন, দেওয়ালের দিকে চাইলেন, আবার এস. ব্যানার্জির সেই দুঃসাহসিক স্টাডিটার দিকে চোখ পড়তেই মাথা নামিয়ে নিলেন। শোভন চুরুট ধরিয়ে নিলে।

—সেদিন বিস্তর খেয়ে এসেছিলুম আপনাদের ওখান থেকে। খুব যত্ন করেছিলেন কাকাবাবু।

অশ্বিনী হাসলেন। হাসিটা বিস্বাদ। হাতের গোল করা ছাতাটা অল্প অল্প ঠুকতে লাগলেন মেজেতে।

—বলুন, খবর কী?

জবাব দেবার আগে অশ্বিনী ইতস্ততঃ করলেন একটু। একবার খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন গলাটা।

—কথাটা—কী বলে—একটু ইয়ে—মানে সেই জন্যেই এত রাত্রে আসতে হল।

কিছু টাকা চাইবেন খুব সম্ভব। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে কয়েকবার। বিরক্তি বোধ হল, কৌতূহলও জাগল তার সঙ্গে।

—বলুন না, এত সংকোচ করছেন কেন?

অশ্বিনী গলা নামালেন: একটা চাকরি দিতে পারেন?

—চাকরি? কাকে?—শোভন আশ্চর্য হয়ে গেল: আপনি কি আর কাকাবাবুর ওখানে কাজ করবেন না?

—আমার নিজের জন্যে নয়।—অশ্বিনী আবার গলা পরিষ্কার করে নিলেন: মানে, এই ধরুন পঞ্চাশ ষাট টাকার একটা কাজ—একটি মেয়ের যাতে চলে যায়—

চকিতে একটা সন্দেহ সাড়া দিয়ে উঠল শোভনের মনে: কোন্ মেয়ের কথা বলছেন আপনি?

—অনীতা মা। সায়েব যাকে অ্যানী বলেন।

—অ্যানী!—শোভন ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে অ্যাশ্‌ট্রের ওপর রাখল: কী চাকরি করবে সে? তা ছাড়া কাকাবাবুই বা ছাড়বেন কেন ওকে?

—না ছাড়লেও ছেড়ে আসতে হবে। মেয়েটার বাঁচা দরকার।

কথাটা তীরের মতো কানে এসে বিঁধল।

—কী বলছেন অশ্বিনীবাবু? ঠিক বুঝতে পারছি না।

অশ্বিনী আবার বিস্বাদ হাসি হাসল: সব কথা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বলবার সাহসও আমার নেই। কিন্তু দিতে পারেন মেয়েটাকে একটা কাজ? কলকাতায় তো আপনার অনেক জানাশোনা আছে—ব্যবসা করেন—

—জানাশুনো আমার বিশেষ কারুর সঙ্গেই নেই। সেটা বরং কাকাবাবুরই বেশি থাকা উচিত।

—বললুম তো, ওঁকে দিয়ে ঠিক সুবিধে হবে না—অশ্বিনী আবার একটু চুপ করে রইলেন: দেখুন, আমার ছেলে মেয়ে নেই, অনীতা মা-কে আমি মেয়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। আমি আপনাকে

হাতে ধরে মিনতি করছি, দয়া করে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি।

যেমন অদ্ভুত, তেমনি অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিপন্ন হয়ে শোভন বললে, লেখাপড়া কিছু না জানলে কোনো চাকরি বাকরি—

—একেবারে জানে না তা নয়। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। সেই সময় টাইফয়েড হয়ে আর পরীক্ষা দিতে পারেনি। তারপর তিন চার বছর ধরে যা পড়ত কিছুই মনে রাখতে পারত না। কাজেই বাধ্য হয়ে ওখানেই শেষ করতে হল। নইলে অনীতা মা লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না, স্কুলে বছর বছর প্রাইজ পেত।

শোভন ভুরু কোঁচকালো: আপনি তো দেখছি অনেক খবর রাখেন ওঁদের সম্পর্কে।

—জানবারই তো কথা স্যার। বিশ বছরের সম্পর্ক।

—বিশ বছর? যতদূর শুনেছি কাকাবাবু তো মাত্র বছর চারেক হল রিটায়ার করেছেন।

—চাকরির আমলে আমি ওঁর স্টেনো ছিলুম। যেখানে বদলি হতেন, আমাকেও নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। খুব ভালোবাসতেন আমাকে। ওঁর দু'বছর আগে আমি রিটায়ার করি—দেশে কিছু জমি জমা আছে, চাষবাস দেখছিলুম। উনি আমাকে ছাড়লেন না, চিঠি দিয়ে ডেকে এনে এখানে ম্যানেজার করে নিলেন।—অশ্বিনী যেন অনেকক্ষণের আটকে রাখা নিঃশ্বাস এক সঙ্গে ছেড়ে দিলেন: মাঝে মাঝে ভাবি, ছেড়ে দিয়ে আবার দেশে চলে যাই—কিন্তু—সত্যি বলতে কি জানেন, অনীতা মা-র জন্যেই আমার এত খারাপ লাগে। ওর যদি একটা গতি করতে পারতুম, তাহলে আর ভাবনা থাকত না আমার।

শোভন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অশ্বিনীর দিকে। তাহলে লোকটিকে সে যা ভেবেছিল তা নয়। সারা জীবন সরকারী চাকরি করেছেন,

স্টেনো ছিলেন, সুতরাং লেখাপড়া কিছু জানেন, অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। তার চাইতেও বড়ো কথা—অনীতা সম্পর্কে ওঁর আশ্চর্য মমতা। চ্যাটার্জি সাহেব তাঁর কুকুটিকে খুব প্রীতির চোখে যে দেখেন না, সেটা সেদিনই সে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু এর ভেতরে আর একটা কথা এনেছেন অশ্বিনী হালদার: মেয়েটার বাঁচা দরকার।

চুরুটটা তুলে নিয়ে আবার আগুন ধরালো শোভন।

—অনীতা তো—এবার তার আনী বলতে কি রকম বাধল: শুনেছি অনাথ মেয়ে। চ্যাটার্জি সাহেব দয়া করে নাকি ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—অনাথ মেয়েই বটে—অশ্বিনীর চোখ হঠাৎ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল: দয়া করেই আশ্রয় দিয়েছেন! কী বলব স্যার, অনেকদিন ধরে নিমক খাচ্ছি, নইলে—একবার থেমে গিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন: যাক সে সব কথা। আমি শুধু এই নিবেদনটুকু করতে এসেছিলুম যে নার্স-টার্সের চাকরিও যদি একটা জুটিয়ে দিতে পারেন, তা হলে বেঁচে যায় মেয়েটা।

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ রইল। রাত্রির ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ঝড় তুলে লরী ছুটে গেল একটা, কুকুরের চিৎকার কানে আসতে লাগল দূরে কাছে, শোভনের বাগানে কোথায় পাঁচা ডাকল আর চারদিকে বেজে চলল ঝিঁঝির আওয়াজ।

শোভন বললে, আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব যথাসাধ্য।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। মাঝে মাঝে খবর নেওয়ার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করব হয়তো—কিছু মনে করবেন না। মেয়েটার জন্যে সত্যি ভারি দুশ্চিন্তায় আছি—নইলে—অশ্বিনী তাঁর গোল করে পাকানো ছাতাটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আর একটা কথা বলব স্যার আপনাকে?

—বলুন না?

—আমি যে এ ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আপনি যেন সেটা আর চ্যাটার্জি সাহেবকে—

—বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন অশ্বিনী। তাঁর সাইকেল চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল।

—খাবার তৈরী হয়েছে—এক ঘণ্টা পরে এই খবরটা জানাতে এসে মনোহর শোভনের ধ্যান ভাঙালো। আর এতক্ষণ ধরে শোভন শুধু একভাবে তাকিয়ে ছিল সামনের ল্যাণ্ড্ স্কেপটার দিকে—যেখানে পাথরের ওপর আছড়ে-পড়া সমুদ্রের সাদা ফেনাগুলো লালে লাল, যেখানে হাওয়ায় নুয়ে পড়া তাল-নারকেলের বনে একটা মত্ত ঝড়ের গতি আর দূরের কালো জলের ওপর একটা আবছা জাহাজের ছায়ামূর্তি অনেকগুলো ম্লান আলোর চোখ মেলে নিস্তব্ধ।

কৌতূহল? না—অবচেতন মনের তাগিদ? শোভন ঠিক বুঝতে পারল না।

পরদিন বিকেলে খানিকটা বেড়াবার জন্যেই সে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। খানিক পরেই তার খেয়াল হল, যখন সে বড় রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে, তারপর সোজা রওনা হয়েছে ঘোষদীঘির পথে।

স্কুটার থামিয়ে শোভন দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিকেলের মাঠ। দূরে কাছে চাষীরা কাজ করছে। পড়ন্ত রোদে নানা জাতের পোকা উড়ছে চারদিকে। গোরুর পিঠে সোয়ার হয়েছে ফিঙে, একটা জলার ধারে কয়েকটা খঞ্জন নাচানাচি করছে। শোভন নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কেন সে চলেছে শ্রীধর চাটুজ্জের ওখানে? কী দরকার আছে তার?

দরকার বলতে গেলে কিছুই নেই, চ্যাটার্জি সাহেব অনুরোধ করেছিলেন তাকে—মাঝে মাঝে এসে যেন খবর নেয়। কিন্তু তিনদিনও হয়নি। তাহলে কি কাল রাত্রে অশ্বিনী হালদার—

ফিরে যাবে? কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়ারই বা কী দরকার? একবার দেখাই যাক না।

শোভন এগিয়ে চলল। 'জয়তারা রাইস মিলে'র সামনে জন কয়েক লোক কী সব কাজ করছে, কিন্তু অশ্বিনী হালদার কিংবা চ্যাটার্জি সাহেব কাউকেই চোখে পড়ল না। হয়ত ভেতরে আছেন ওঁরা। একবার ঢুকবে নাকি মিলের ভেতর? নাঃ, থাক—বাড়ীতেই আগে খবর করে আসা যাক।

গেট খুলে দিয়ে দারোয়ান সেলাম করল। সঙ্গের স্কুটার, সেদিন স্বয়ং সাহেবের আপ্যায়ন, সব মিলিয়ে শোভন সম্পর্কে কিছু একটা বুঝে নিয়েছে। সসম্মানে বললে, যাইয়ে।

শোভন এগোল। বাগানে বুগেনভিলিয়া লালে লাল। বারান্দায় কালো সিমেন্টের থামটাকে ঘিরে আইভি। সামনে করুণাময় খ্রীস্টের মূর্তি। ড্রয়িং রুমের সামনে সেই ঝোলানো পর্দা।

একটু আগেই কানে এসেছিল, এখন স্পষ্ট হল। বসবার ঘর থেকে বেহালার সুর আসছে। মনে হল, রেডিয়ো।

শোভন গলা চড়িয়ে ডাকল: কাকাবাবু।

বেহালাটা হঠাৎ থেমে গেল।

—কাকাবাবু আছেন?

একটা হালকা পায়ের আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে দেখা দিলে শ্যামবর্ণা দীর্ঘদেহিনী মেয়েটি। পরনে সেই কালো পাড়ের সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, শীর্ণ হাতে ক' গাছা কাঁচের চুড়ি। অনীতা।

শান্ত শ্যামল মুখে এক টুকরো লজ্জার হাসি ফুটল: নমস্কার।

—নমস্কার। কাকাবাবু নেই?

—না।

—মিলে আছেন?

—কলকাতায় গেছেন সকালে। কাল ফিরবেন।

—ওঃ, জানতুম না।—শোভন অপ্রতিভ হল : আচ্ছা আমি চলি তা হলে।

—এসেই চলে যাবেন কেন?—অনীতা আবার সংকোচের হাসি হাসল : বসুন, চা খান।

শোভন দ্বিধা করতে লাগল : আমি বরং আজকে—

—আপনি চা না খেয়ে চলে গেলে আপনার কাকাবাবু রাগ করবেন আমার ওপর। আসুন।

এরপরে আর ফেরা যায় না। শোভন ভেতরে পা দিলে।

বেহালার রহস্যটা ধরা পড়ল ঘরে পা দিয়েই। একটা সোফার ওপর পড়ে আছে বাজনাটা। অনীতাই বাজাচ্ছিল।

অনীতা বললে, বসুন।

—তা না হয় বসছি। কিন্তু বেহালা আপনিই বাজাচ্ছিলেন বুঝি? বেশ হাত তো আপনার।

শ্যামল মুখের ওপর রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটল। অনীতা যেন আরো শীর্ণ হয়ে দেওয়ালের গায়ে লুকিয়ে যেতে চাইল : ও কিছু নয়, বাজাতে আমি জানি না, মাঝে মাঝে এক আধটু চেষ্টা করি কেবল। আপনি বসুন, আমি চা করে আনি।

—চায়ের জন্যে আমার তাড়া নেই—অশ্বিনীবাবুর সমস্ত কথাগুলো শোভনের মনের ওপর দিয়ে যেন ভেসে চলে গেল : আপনি যদি না বসেন, তা হলে আমি এখুনি বেরিয়ে যাব এখান থেকে।

অনীতার চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া পড়ল একটা। মনে হল, কেউ তাকে এমন একটা জটিল সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শোভনের সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই সে মাথা নামাল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

শোভন হাসল : আপনি সত্যিই কি বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন? বেশ, আমি তা হলে যাচ্ছি।

—না-না, বসছি আমি।

তবু সোফায় বসল না, একটা বেতের টুল টেনে নিয়ে এমন জড়োসড়ো ভঙ্গিতে আসন নিলে যে তার দিকে তাকিয়ে শোভনের অনুকম্পা হতে লাগল।

—আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন?—ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা এগিয়ে দিলে শোভন, এই মেয়েটির মনের জড়তা জোর করেই ভেঙে দিতে চায় সে: আমি হঠাৎ এসে পড়াতে নিশ্চয় খুব বিরক্ত হয়েছেন —না?

—কী আশ্চর্য, ছি—ছি—অনীতার মুখে আবার রক্তের রঙ দেখা দিলে: বিরক্ত হবো কেন?

—নইলে আমাকে দেখে এ ভাবে ছটফট করতেন না। মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ বাঘের মুখে পড়ে গেছেন।

লজ্জার ভেতরও অনীতা হেসে ফেলল। সুন্দর কয়েকটি দাঁতের ঝিলিক উঠল, হাসলে এই কালো কুরূপা মেয়েটিকেও বেশ ভালো দেখায়। বাইরে যার কিছু নেই, ভেতরে তারও কোথাও ঐশ্বর্যের সঞ্চয় আছে খানিকটা।

অকারণেই শোভন প্রগলভ হয়ে উঠল। একটা নিষ্প্রাণ মূর্তিকে যেন জাগিয়ে তুলতে চাইছে সে, এই মেয়েটির নিঃসঙ্গ বেদনাকে একটু খানি লঘু করবার দায়িত্ব যেন কে তার মনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। শোভন বললে, এই তো বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন দেখছি। তা হলে একটু আগে যা করছিলেন, তাই করুন। মানে বেহালাটা আবার বাজান।

আবার শীর্ণ হয়ে গেল অনীতা।

—মাপ করবেন, বাজাতে আমি জানি না।

—বাজাতে আপনি ভালোই জানেন। নিন, বেহালাটা ধরুন।

—আজ নয়, আর একদিন বরং শোনাবো।

—না, আজকেই। আর যদি না বাজান—শোভনের চোখ দুষ্টুমিতে চক চক করে উঠল: তা হলে কাকাবাবু ফিরে এলে

আমি এই বলে নালিশ করব যে আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

—ঝগড়া ?—অনীতা আশ্চর্য হল : কই, ঝগড়া করিনি তো ?

—ঝগড়া হয়ে যাবে। বাজনা না শোনালেই।

অনীতা চুপ করে রইল। একটা নতুন, অপরিচিত অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন করে কেউ জোর দেখায়নি তার কাছে, কেউ দাবি করেনি কোনদিন। যে বিষাদ আর ভয়ের নিঃসঙ্গ জগতে তার বাস, সেখানে মধ্যে মধ্যে অশ্বিনী কাকা এসে এক আধপশলা স্নেহ বৃষ্টি করেন, কিন্তু—

ধীরে ধীরে বেহালাটা তুলে দিলে সে। আস্তে আস্তে বললে, আমি কী বাজনা শোনাব আপনাকে। ভালো করে শিখতেও পারিনি। বাড়ীর কুকের কি এসব বিলাস শোভা পায় ?

হঠাৎ অকারণেই শোভন বলে ফেলল : মিথ্যে কথা। আপনি 'কুক্' নন।

কোথা থেকে কী ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল অনীতার মুখের রঙ, হাত থেকে বেহালাটা আছড়ে পড়ল মেজেতে—এক ছুটে পালিয়ে গেল অনীতা।

মিনিটখানেক বসে রইল শোভন। বেহালাটা তুলল মেজে থেকে —ভাঙেনি। সোফার ওপর সেটাকে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কোথায় একটা মারাত্মক অন্যায় হয়ে গেছে, তার এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার।

বাগানের মধ্যেই সে স্কুটারে স্টার্ট দিলে, বেরিয়ে পড়ল দ্রুতগতিতে, অভ্যাসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করল দারোয়ান।

সেই সময় পেছন থেকে চ্যাটার্জি সাহেবের ছোকরা চাকরটা ডাক দিল : বাবু—বাবু—চা খেয়ে যান, দিদিমণি ডাকছে—

শোভন শুনতে পেল না।

'জয়তারা রাইস্ মিল' পেরিয়ে যাওয়ার সময় আর একজনের

ডাকও কানে গেল তার। তিনি অশ্বিনী হালদার—স্কুটারের আওয়াজ শুনে মিলের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। মিলের কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী দেখলেন গোধূলির লাল আলোয় লাল স্কুটারের দীর্ঘ আরোহীটি মাঠের ওপারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সাত

তিন চারটে দিন কাটল বিশ্রী একটা অস্বস্তির ভেতর।

মামার সঙ্গে চিত্রারা বেড়াতে এসেছিল এখানে—একটা ক্লান্ত অলস দুপুরকে যেন সুধায় ভরে দিয়ে গেছে। চিত্রার ছোট সেই নীল রুমালটি। তার ড্রয়ারটাই একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধে একাকার হয়ে আছে। একা বসে বসে ওই মেয়েটির কথা ভাবতে তার ভালো লাগে অকারণেই উর্দু শায়রটা ভেসে ওঠে মনের ভেতর: "মেরে জিন্দগী আন্ধেরে মে—"

কিন্তু সুর কেটে যায়। একটি লম্বা, কালো মেয়ে। সাদা শাড়ী সাদা ব্লাউজ। চোখের পাতা দুটো যেন ক্লান্তিতে ভারী হয়ে আছে সব সময়। নিজের চারদিকে একটা ভয়ের আবরণ গড়ে নিয়ে তারই মধ্যে বাস করছে সে; শোভন তাকে সেই আড়ালের ভেতর থেকে একটুখানি বের করে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু—

কী একটা আছে কোথাও। অশ্বিনী হালদার বলতে বলতেও থেমে যান। 'আপনি কুক্ নন'—এই ছোট্ট কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অনীতার হাত থেকে বেহালাটা আছড়ে পড়ে যায়। যেন সামনে মৃত্যুকে দেখেছে এমনি ভাবে ছুটে পালায়।

মনের ভেতর মেঘ জমতে থাকে আস্তে আস্তে।

অথচ, কেন তার এ সব ভাবনা! শ্রীধর চ্যাটার্জি তার পিতৃবন্ধু, ডেকে পাঠিয়ে আলাপ করেছেন, খাইয়েছেন—এইটুকুই যথেষ্ট তার পক্ষে। তাঁর বাড়িতে যে আশ্রিতা মেয়েটি রান্না করে, সংসার দেখে —তার জন্যে কী তার এমন মাথাব্যথা?

মাথাব্যথা থাকত না, যদি না অশ্বিনী হালদার সেদিন এসে মেয়েটির একটা চাকরির জন্যে তার কাছে তদ্বির করে যেতেন।

ওই ভদ্রলোকের ওপরেই এখন তার বিশ্রী একটা রাগ হতে লাগল। কোনো দরকার ছিল না, খামোকা এসে তার মনের শান্তি নষ্ট করে দিলেন ভদ্রলোক। আশ্চর্য উৎপাত যা হোক।

আর সেই যে অশ্বিনীবাবু গেছেন, এর ভেতরে তাঁর আর দেখা নেই। অনীতার চাকরি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন বলেও ছিলেন চারদিনের মধ্যে, সে খবর নেওয়ার তাঁর আর দরকার পড়ল না। কথাটা মনে হতে শোভন নিজেই লজ্জা পেল। বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটে দিনের ভেতরেই যে কেউ কাউকে আজ-কাল চাকরি করে দিতে পারে না, অশ্বিনীবাবুর মতো একজন বিচক্ষণ লোক অন্তত সেটা জানেন!

সকালে শৈলেশ্বরের শেল্‌ফ থেকে একটা ইংরেজী উপন্যাস নামিয়ে এনে শোভন পড়তে চেষ্টা করছিল, আর এই সব এলোমেলো ভাবনায় বারে বারে মনোযোগ ছিঁড়ে যাচ্ছিল তার। এমন সময় মুকুন্দবাবু এলেন।

বই নামিয়ে রেখে শোভন বললে, এই যে, কী খবর?

মুকুন্দ মাইতিকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হল। পার্চমেণ্টের মতো একখানা মোটা লম্বা সাইজের পুরোনো কাগজ তিনি এগিয়ে দিলেন শোভনের দিকে—অফিসের পুরোনো কাগজপত্রের ভেতর হঠাৎ পেয়ে গেছি স্যার। দেখুন।

—কী এ?

মুকুন্দবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ধরা গলায় বললেন, চোখ বুলিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

শোভন কাগজটা খুলল। হাতচিটা।

কিন্তু তলার সইটায় চোখ পড়তেই সে উঠে বসল সোজা হয়ে। ঝকঝকে পাকা হাতে নিজের পুরো নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে, শ্রীধর চ্যাটার্জি। তারও নীচে লেখা আছে: প্রোপ্রাইটার, জয়তারা ফাইসমিল, পোস্ট অ্যাণ্ড ভিলেজ ঘোষদীঘি।

বক্তব্য পরিষ্কার। অমুক ঠিকানার, অমুক পোল্ট্রির মালিক শ্রীশৈলেশ্বর ব্যানার্জির কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন তিনি। সুদের পরিমাণ এত পার্সেন্ট।

শোভন চমকে উঠল।

—কাকাবাবু ধার নিয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে?

মুকুন্দ বললেন, টাকা অনেক নিয়েছেন সে আমরা জানি। সেদিন সে কথা বলেওছিলুম আপনাকে। কিন্তু কর্তা যে রসিদ নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত তা আমরা কেউ জানতুম না। কতগুলো পুরোনো ধুলোভরা ফাইল ফেলেই দিতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তার ভেতরে এটা পেয়ে গেলুম।

শোভন চুপ করে রইল।

মুকুন্দ বলে চললেন, কর্তা পয়সার দিকে কখনো ফিরেও চাননি। কিন্তু শেষ জীবনে যখন মতিগতিটা একটু—একবার থেমে গিয়ে আবার বলতে লাগলেন: মানে, অনেকটা সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুটিকেও চিনে নিয়েছিলেন আশা করি। তাই রসিদ না দিয়ে আর টাকা দেননি। কিন্তু ভুলো মানুষ, আয়রন সেফে তুলে রাখার কথাটাই আর মনে ছিল না।

—হুঁ।

মুকুন্দ উৎসাহিত হয়ে বললেন, খুঁজে দেখতে হবে ভালো করে, আরো কাগজপত্র কিছু যদি পাওয়া যায়—একটা অভিজ্ঞ হাসির রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটে: অত আদর করে নেমন্তন্ন করবার মানে বুঝতে পারছেন এবার?

শোভন জবাব দিল না। ইঙ্গিতটা তার খারাপ লাগল।

মুকুন্দ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী করবেন স্যার?

—দেখি।

—টাকাটা আদায় করতে হলে একটু তাড়াতাড়িই স্টেপ নেওয়া দরকার। তারিখ দেখছেন তো? তামাদি হয়ে যাবে এরপর, তখন আর কিছুই করা যাবে না।

—নালিশ করতে হবে বলছেন?—ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করল শোভন।

—টাকা না দিলে তো করতেই হবে। তার আগে চিঠি দিন।

—কিন্তু বাবার বন্ধু, আমাকে এতটা স্নেহ করেন—

—পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দেবেন নাকি?—মুকুন্দবাবু তীক্ষ্ণভাবে বললেন, ফার্মের অবস্থা তো নিজেও জানেন। এমনি এক রকম চলে যাচ্ছে, কিন্তু ক্যাপিটাল বলতে ব্যাঙ্কে বিশেষ কিছুই নেই। ভগবান না করেন—হঠাৎ যদি কোনো রকম একটা ধাক্কা আসে, তখন সামলে নেওয়া শক্ত হবে। ইন্‌টারেস্ট নিতে না চান—না-ই নিলেন, কিন্তু এতগুলো টাকা নিশ্চয় এভাবে খয়রাত করা যায় না।

—তা যায় না। তবু কাকাবাবুর সঙ্গে—

—কিছু মনে করবেন না স্যার—মুকুন্দবাবুর গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: চ্যাটার্জি সাহেবকে আপনার চাইতে আমরা বেশি চিনি। কর্তার কাছ থেকে পনেরো ষোলো বছরে উনি যত টাকা নিয়েছেন, তার সবটা যদি উসুল করা যেত, তা হলে ওই জয়তারা রাইস মিল্ নীলেমে উঠত।

—উনি যে আগেকার টাকাগুলো শোধ করেন নি, আপনি নিশ্চিত ভাবে জানেন?

মুকুন্দের মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠল একটা: জানিনে, কিন্তু ওঁকে তো চিনি। ওই একটা গুণ আছে ওঁর, হাত চিৎ করতেই জানেন, উপুড় করাটা কখনো শিখলেন না। যাই হোক, এ টাকাটা আদায় করতে হবে। অবস্থা ওঁর খারাপ নয়, একটা রাইস মিল চালাচ্ছেন, বাজার হালে আছেন, পাঁচ হাজার টাকা ঝট করে ফেলে দেওয়া ওঁর পক্ষে কিছুই শক্ত হবে না, আমরাও বেঁচে যাব।

—আচ্ছা ভেবে দেখি।

মুকুন্দবাবু উঠলেন। পুরোনো কর্মচারী, শৈলেশ্বরের আমলের মানুষ—বলতে গেলে পোল্‌ট্রিটা তাঁরই হাতে গড়া। কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে তারপর বললেন, কাগজটা যত্ন করে তুলে রাখুন, হারাবেন না।

—না-না।

মুকুন্দ চলে গেলে আবার একরাশ তিক্ত বিরক্তির উচ্ছ্বাস এসে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল শোভনের। এ আর এক নতুন উপদ্রব দেখা দিল। এই হ্যাণ্ডনোট-টা এতদিন চোখের আড়ালে ছিল, আরো অনন্তকাল থাকতে পারত, তারপর একদিন একবারেই লুপ্ত হয়ে যেতে পারত। এই পাঁচ হাজার টাকার অস্তিত্বের সংবাদ না জেনেও তার পোল্‌ট্রি চলছিল, চলতও। কিন্তু এখন কি টাকাটা ছাড়া যায় আর?

কেন ছাড়া যায় না? তার বাবা বন্ধুকে বহু টাকা ধার দিয়েছেন, আর ফিরে পাননি, ফিরেও চাননি খুব সম্ভব। তা হলে মিথ্যেই সে কেন একটা অপ্রীতির কুৎসিত আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে তুলবে? কী দরকার?

দরকার বোধ হয় একটু আছে। শেষ জীবনে বাবার নিশ্চয়ই কোথাও খট্‌কা লেগেছিল, নইলে বন্ধুর কাছ থেকে এই হ্যাণ্ডনোট তিনি কেন নিলেন? টাকাটা নিশ্চয়ই ফেরৎ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। সারা জীবনের উচ্ছৃঙ্খল বে-হিসেবী এস ব্যানার্জি শেষ জীবনে যখন আত্মস্থ আর অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন আরো অনেক ভুলের মতো এ-ও তিনি সংশোধন করে নিতে চেয়েছিলেন। শোভন কেন টাকাটা ছেড়ে দেবে?

হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গোটা কয়েক কথা।

শ্রীধর যেন নিতান্ত আলগা ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন: 'সব ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মোটামুটি।'

'ডেবিট ক্রেডিট্‌ সমস্তই?'

'খাতা-পত্রে যতটা পেয়েছি।'

'কোনো আউটস্ট্যাণ্ডিং দেনাদার কিংবা পাওনাদার—'

'আজ্ঞে না, সে রকম কিছু বিশেষ চোখে পড়েনি।'

"খুব ভালো কথা—"ওই ভাবেই প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীধর।

এখন যেন ব্যাপারটার অর্থ বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্ভব ওই পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপারটাই ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন একটু। বুঝতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা শোভনের আদৌ জানা আছে কিনা।

বিতৃষ্ণায়, বিরক্তিতে সমস্ত মন কালো হয়ে উঠল শোভনের। এ এক বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল যা হোক। সে যদি টাকাটা ছেড়েও দিতে চায়, মুকুন্দবাবু ছাড়বেন না। এই পোল্‌ট্রি তিনি কর্মচারী কিন্তু সব জিনিসটা তাঁর নিজের হাতে তৈরী, শোনা যায়, দিল্লী বা বোম্বাই কোথায় একটা ফার্মে তিনি চাকরি করতেন আগে, আর শৈলেশ্বরকে আইডিয়াও তিনিই দিয়েছিলেন। পোলট্রি সঙ্গে তাঁর অসীম মমতার সম্পর্ক—একটা হাঁস কিংবা মুরগী মরে গেলেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। আর যদি না ছাড়েন, তাঁকে বারণ করবার শক্তি শোভনের নেই। স্বয়ং শৈলেশ্বরও যে কোনোদিন তাঁকে বাধা দেননি, এ খবরটাও শোভনেব অজানা নয়।

আর তা ছাড়া শ্রীধরকে মুকুন্দ বাবু, বলাই বাবু, কেউই যে দু চক্ষে দেখতে পাবেন না, প্রথম দিনেই তো সে তা বুঝতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে টঁ্যাস ফিরিঙ্গির মেয়ে বিয়ে করে ক্রীশ্চান হয়েছেন— মনের দিক থেকে এটাকেই প্রথমে মেনে নেওয়া শক্ত। বামুনের ছেলে মুরগীর ব্যবসা করলে এখন আর কেউ নাক সিঁটকোয় না, ধাতস্থ হয়ে গেছে ; অসবর্ণ বিয়েতে গা জ্বালা করলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া চলে ; কিন্তু শ্রীধর চ্যাটার্জির সবটাই বিজাতীয়। বিশেষ করে গাঁয়ের ভেতর সাহেবী করা, আর টাকা-পয়সা সংক্রান্ত অখ্যাতি, সব মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁকে জব্দ করবার সুযোগ পেলে কেউই তা ছাড়তে রাজী নয়।

তার মানে, সোজাসুজি টাকাটা চাইতে হবে এখন। আর না পেলে মামলা।

ইচ্ছে করতে লাগল, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালায় এখান থেকে।

এর চাইতে তার আগ্রাই ভালো। সেই সাইকেল আর মোটর পার্টসের ব্যবসা। কী হবে বাংলা দেশের এই নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে কাল কাটিয়ে? সে পালাবে।

কিন্তু চিত্রা। আর ওই অনীতা মেয়েটিকে ঘিরে ঘিরে একটা কৌতূহলের আবরণ। এত সহজেই কি পালানো যাবে এখান থেকে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাণ্ডনোটটা সে ড্রয়ারে ভরে ফেলল।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাটল তার পরে।

এর মধ্যে না অশ্বিনী হালদার, না শ্রীধর চ্যাটার্জির দিক থেকে কোনো খবর।

চ্যাটার্জি সাহেব নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন, সেটা এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। কিন্তু অশ্বিনী কেন আর আসছেন না? অনীতার একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অথচ কুড়ি দিনের মধ্যেও তাঁর আর দেখাই নেই!

আশ্চর্য তো!

একটা কথা থেকে থেকে মনে হয়। অনীতার সঙ্গে দেখা হওয়া, সেই বেহালা বাজাতে শুনতে চাওয়ার পরেকার একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থা, অনীতার পালানো, তার চলে আসা—সব মিলে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছে কোনোখানে।

আর তাই-ই সম্ভব।

অনীতার চাকরির জন্যে কি উপযাজক হয়ে এসেছিলেন অশ্বিনী, না—অনীতাই পাঠিয়েছিল তাঁকে? আর সেই একটি কথা:

'মিথ্যে, আপনি কুক্ নন'—সেইটেই কি সমস্ত গণ্ডগোলের কারণ, আর অনীতা কি সেই জন্যেই অশ্বিনীকে আসতে বারণ করে দিয়েছে তার কাছে? বোঝা যাচ্ছে না।

অথচ, অশ্বিনীর সঙ্গে এর মধ্যে তার যে একেবারে দেখা হয়নি, তাও নয়। একদিন বাসে চেপে কোথায় চলেছিলেন, হাত তুলে

অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর একদিন স্কুটারে যেতে যেতে চোখে পড়েছিল, পথের ধারে একজন চাষীর ঝাঁকা নামিয়ে অশ্বিনী কুমড়োর দর করছেন।

স্কুটারের আওয়াজে চোখ তুলে তাকিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভালো তো?'

গাড়ীর স্পীড থামিয়েছিল শোভন, ভেবেছিল, আলাপ করবে। কিন্তু ততক্ষণে আবার মাথা নামিয়ে অশ্বিনী কুমড়ো পরীক্ষা করছেন। সুতরাং আর দাঁড়ানো চলল না—শোভন এগিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই অকারণেই অন্তরঙ্গ হয়ে এসেছিলেন, আবার তার পরেই নিরাসক্তিতে ডুবে গেছেন। অদ্ভুত এই বাংলা দেশের লোক। এদের যত বেশি কবে দেখছে, ততই বিরক্তিতে মন ভরে উঠছে তাব।

অনেক দিন অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে দেখেছে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যেন সাইকেলটা বাঁক নিচ্ছে ঘোষদীঘির দিকে। দুরন্ত প্রলোভনের উচ্ছ্বাস উঠেছে মনে। চোখের সামনে ছুটেছে সেই বাগানটা—যেখানে বুগেনভিলিয়া আবীরের রঙে লালে লাল। সেই বাড়ীটা—খ্রীস্টের ছবি, তার বাবার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ, একটি সাদা শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ পরা রোগা লম্বা মেয়ে—পড়ন্ত বিকেলের আলোয় একা বসে বেহালা বাজাচ্ছিল। বাংলা দেশের গ্রাম—বাঙালীর বাড়ী, অথচ সমস্তটা মিলিয়ে যেন একটা বিদেশী কবিতার মতো। চেনা-অচেনাব মাঝখানে একটা অপরূপ রোমাঞ্চ, সমস্ত অনুভূতিতে অস্পষ্ট সুরের ঝঙ্কার।

তবু যাওয়া চলেনি।

না যাওয়ার আরো কারণ আছে।

দিনকয়েক আগেও মুকুন্দবাবু জিজ্ঞেস করছেন: হ্যাণ্ডনোটটার কথা ভাবলেন কিছু?

—না, মানে, এখনো—

মুকুন্দবাবুর চোখের দৃষ্টি শীতল হয়ে এসেছিল: তারিখটা লক্ষ্য

করে দেখেছেন তো ভালো করে? বেশি দেরী হলে তামাদি হয়ে যাবে —মনে আছে তো সে কথা?

—মনে আছে আমার।

মুকুন্দবাবু চলে গেছেন, কিন্তু খুশি হয়ে যান নি। তিনি ছাড়বেন না। চ্যাটার্জি সাহেব সম্পর্কে অনেক দিনের অনেক জ্বালা জমে আছে মনের মধ্যে, সুযোগ একবার হাতে যখন এসেছে, কিছুতেই ফসকে যেতে দেবেন না।

শোভন ভাবে, হ্যাণ্ডনোটটাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে, কিংবা দেশলাই জ্বেলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। আরো সন্দেহ হয়েছে, টাকাটার কথা আর গোপন নেই এখন। মুকুন্দ-বাবু যখন কাগজটা পেয়েছেন তখন বলাই বাবুরও অজানা নেই; আর বলাই বাবুর জানার মানেই হল, এতদিনে লোকের মুখে মুখে কথাটা শ্রীধর চ্যাটার্জির কানেও গিয়ে উঠেছে। কারণ বলাই বাবু কথা বলতে ভালোবাসেন—একটু বেশি পরিমাণেই ভালবাসেন।

তা হলে এই জন্যেই অশ্বিনী আর অন্তরঙ্গতা করতে আসে না।

সেদিনও কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কী খেয়াল হল। পোলট্রির দিকেই যাচ্ছিল, কী ভেবে ফিরে এল নিজের বসবার ঘরে। মনোহরকে বললে, বলাইবাবুকে ডেকে আনতো একবার।

ডিমের গায়ে নম্বর লিখছিলেন বলাইবাবু, ডাক শুনে উঠে এলেন সেখান থেকেই। হাতে তাঁর তখনো কপিয়িং পেন্‌সিলটা ধরা।

শোভন বললে, বসুন।

বলাইবাবু একটু আশ্চর্য হলেন। কাছে বসিয়ে কোনো গুরুতর আলোচনার মধ্যে টেনে আনার মতো গুরুত্ব লাভ—ওটা মুকুন্দবাবুর ব্যাপার। বসলেন, এবং এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে।

ভুরু কুঁচকে মিনিট খানেক চুপ করে রইল শোভন। তারপর:

—চ্যাটার্জি সাহেব, মানে ঘোষদীঘির শ্রীধর চ্যাটার্জির কাছে আমরা কিছু টাকা পাই। জানেন আপনি?

—জানি। মুকুন্দদা কাগজটা আমাকে দেখিয়েছেন।

—আপনি কি ও নিয়ে আলোচনা করছেন নাকি কারুর সঙ্গে?

বলাইবাবু একটু সতর্ক হলেন। শোভনের জিজ্ঞেস করবার ধরনটা তাঁর ভালো লাগল না।

—না, সে রকম কিছু নয়। তবে দু একজনকে—

—কী বলেছিলেন?

বলাইবাবু একটা ঢোক গিললেন। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হরিনাথ কিছু বলেছে বুঝি আপনাকে?

—কে হরিনাথ?

—হরিনাথ শীল, জয়তারা মিল্‌সে কাজ করে?

—না, তার কাছ থেকে আমি শুনিনি, তার নামও আপনার মুখে প্রথম জানলুম। —শোভনের মুখে সন্দেহের ছায়া ছড়াতে লাগল: কী হয়েছে তার সঙ্গে?

বলাইবাবু ঢোক গিললেন আবার: মানে—এমন কিছু নয়। দিন দশ বারো আগে হাটে হরিনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঠাট্টা করে বললে, 'কি মিঞা, মুরগীর ভাও কি রকম?' আমিও পাল্টা ঠাট্টা করে বললুম, 'মুরগীব ভাও ভালোই—আল্লার দোয়ায় একরকম চলছে। তোমাদের সায়েবকে যীশুর নাম করে বোলো, তাঁর কাছে আমাদের যে টাকাটা পাওনা আছে, সেটা পেলে আরো ভালো—'

হঠাৎ বিশ্রী রকম একটা ধমক দিয়ে শোভন বলাইবাবুকে থামিয়ে দিলে।

—কেন বলতে গেলেন এ-সব বাজে কথা? কী দরকার ছিল আপনার?

বলাইবাবু হতভম্বের মতো চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে বললেন, কথাটা যে চেপে রাখতে হবে, সে তো আমাকে বলেন নি।

—এ-ও কি বলবার দরকার আছে নাকি? বয়েস হয়নি

আপনার? এটা বুঝতে পারেন না যে কাকাবাবু আমার বাবার বন্ধু? তাঁর সঙ্গে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা অন্যভাবে ফয়সালা করতে হবে?

তেমনি মাথা নিচু করে বসে রইলেন বলাইবাবু।

—মাপ করবেন স্যার, আমার অন্যায় হয়েছে।

—আচ্ছা, যান আপনি।

সব জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে গেছে এবার। নিশ্চয় হরিনাথ শীল কথাগুলো দশগুণ ফুলিয়ে তুলে দিয়েছে শ্রীধরের কানে, বাংলা দেশেব লোক এ কাজটা খুব ভালো করেই পারে। আর এই জন্যেই দূরে সরে গেছেন অশ্বিনী, তার সম্পর্কে চ্যাটার্জি সাহেবের আর কোনো কৌতূহল নেই। একটা নগ্ন শত্রুতা বোধহয় ঘনিয়ে আসছে মুখোমুখি। কী কুৎসিত!

অথচ, ওই দলিলটা পাওয়া না গেলে—কী ক্ষতি হত বিশ্বসংসারে? আর ওই সামান্য হাজার পাঁচেক টাকার জন্যে কী আটকে থাকছিল তার পোলট্রির? চুলোয় যাক লক্ষ্মীছাড়া হ্যাণ্ডনোট।

কিন্তু চুলোয় যেতে দেবেন না মুকুন্দবাবু। আর তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথা বলবারও শক্তি শোভনের নেই। এই পোলট্রি তাঁর বুকের পাঁজরা, এর এক একটি পয়সা তাঁর গায়ের রক্ত।

কোথায় যেন একটা অন্ধকার ঘনাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে খানিকটা কালো মেঘ।

তবু এর মধ্যেও রুপালি রেখা জ্বল জ্বল করে। উর্দু কবিতার কয়েকটা লাইন গুঞ্জন করে মনের সামনে:

"ইস্ ইশক নে দিওয়ানা কিয়া ম্যাঁয়
কিয়া বতাউঁ কিয়া কিয়া—"

এই প্রেম আমাকে দিওয়ানা করে দিয়েছে—কী বলব সে আমার কী করেছে!

কিন্তু কার প্রেম?

বাঈজীকে জবাব দিয়েছিল: ম্যাঁয় ইন্তজার কর্ রহা হুঁ। কার জন্যে?

চিত্রার সঙ্গে আরো দু-বার দেখা হয়েছে এর ভেতর।

একদিন ছিল সেই নিমন্ত্রণের পালা। মামার মেসে স্কুটারটা রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল দুজনে।

ব্যবসায়ী ভাগ্যবানেব বাড়ী। উত্তর কলকাতাব ভিড়ের মধ্যেও বাছাই জায়গা। পুবদিকে পার্ক। বাড়ীর সামনে অনেকটা প্রাচীর দিয়ে ঘেবা। সেখানেও লন আছে, ফুলের গাছ আছে, মালী আছে।

কিছুক্ষণ সংকুচিত হয়েছিল শোভন। কলকাতাব বাঙালী বড়োলোকেব সঙ্গে এই তাব প্রথম পরিচয়। নতুন কেতার দামী ফার্নিচার, প্রকাণ্ড পবিপাটি বসবাব ঘর। এস. ব্যানার্জির ছবি নেই, কিন্তু যামিনী বায় আছেন।

দেখা গেল, মামার দুরন্ত খাতির এখানে। ডক্টর ঘোষালকে সবাই খুব ভাল করে চেনে, তার মানে এ বাড়ীতে এর আগেও বার কয়েক তিনি এসে গেছেন। শুধু একটা কথাই শোভন কোনোমতে বুঝতে পারছিল না, এত টাকার যারা মালিক, তাদের মেয়ে হয়েও কেন চিত্রা মামার মেসেই পড়তে যায়? কেন তাঁকে বাড়ীতে এনে পড়ে না—যোগ্য পারিশ্রমিক দেয় না?

প্রচুর খাওয়া দাওয়া, প্রায় উৎসবের আয়োজন। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে আর একটা ছবি ভেসে উঠছিল যেন সেই কালো রোগা মেয়েটি। মাথা নিচু করে পরিবেশন করে যাচ্ছে, আব থেকে থেকে ধমকে উঠছেন কাকাবাবু, কী হচ্ছে অ্যামী, ফ্রাইগুলো আর একটু এগিয়ে দিতে পারো না? তুমি একেবারে হোপলেস,—এতদিনেও ম্যানার্স শিখলে না!

চিত্রা বলেছিল, বারে, কিছুই খাচ্ছেন না যে! রান্না ভালো হয়নি বুঝি?

—চমৎকার রান্না হয়েছে। কিন্তু মাপ করবেন, আর আমার চলছে না।

খাওয়া—গল্প-হাসি। চিত্রার দুটি ছোট ছোট ভাই-বোনের আবৃত্তি। শোভনের তাসের ম্যাজিক। মিসেস্ কুণ্ডুর ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান করা, আর মাঝে মাঝে সস্নেহ চোখে শোভনের দিকে তাকিয়ে থাকা!

—এসো বাবা, সময় পেলেই এসো এখানে। লজ্জার কিছু নেই। ডক্টর ঘোষাল তো আমাদের নিজের লোক!

—আসব।

বেরবার সময় চিত্রা বলেছিল, আবার কবে আসছেন শোভন-বাবু?

—আপনাদের রিটার্ন ভিজিটের পর।

রিটার্ন ভিজিট ও পক্ষ থেকে এখনো হয়নি, মিস্টার কুণ্ডু ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। মামার ওখানেই। কলকাতায় কিছু হাতের কাজ সেরে যখন মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার মামার খবর নিতে গিয়েছিল, কী যেন পড়াশুনার আলোচনা চলছিল তখন দুজনের ভেতর।

কলধ্বনি করে সম্ভাষণ জানিয়েছিল চিত্রা।

—বারে, আর গেলেন না তো আপনি?

খুব ঘন ঘন মিস্টার কুণ্ডুর ওখানে যাওয়ার মত সম্পর্কটা যে এখনো গড়ে ওঠেনি, এই কথাটা মনে এলেও মুখে এল না। শোভন জবাব দিয়েছিল, আপনারাও তো আর এলেন না।

—আমি তো যেতেই চাই, কিন্তু স্যার যদি রাজী না হন্ যাই কী করে?

শোভন বলে ফেলেছিল, বেশ তো একাই চলে আসবেন!

—একা?

—ক্ষতি কী! গাড়ী নিয়ে চলে আসবেন, বড় জোর সোয়া ঘণ্টার রাস্তা।

চিত্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, মোটা একটা বইয়ের পাতা থেকে চমকে যেন মাথা তুলেছিলেন মামা। আর শোভনের তখন মনে হয়েছিল, কথাটা বলা তার আদৌ উচিত হয়নি। দূর পাড়া গাঁয়ের বাংলোয় সে একা থাকে, একটি মহিলা নেই বাড়ীতে—সেখানে কোনো মেয়েকে এইভাবে নিমন্ত্রণ জানানোটা যেমন অন্যায়, তেমনি বিসদৃশ।

শোভন উঠে পড়েছিল।

—মামা, চলি আজ।

—সেকি রে, বসলি নে, চা খাওয়া হল না—

—হবে আর একদিন। চলি আজ—

চিত্রাকেও আর একটা কথা বলল না—সোজা স্কুটার নিয়ে বাড়ীর রাস্তায়।

যতক্ষণ আলো থাকে, পথে ভিড় চোখে পড়ে, লেভেল ক্রসিঙে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না। তারপরেই বাংলা দেশের মাঠ জুড়ে কালো সিল্কের ওড়্নার মতো পাতলা অন্ধকার, জলায় ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ, অনেকখানি আকাশ ভরা তারা, দূরের চাপ বাঁধা গাছপালার তমসার ওপর উল্কা খসে পড়া। তখন শুধু কানের কাছে একটি গুঞ্জন: "মেরে সাথ্ তুম্নে আকর রাহ কর দী রোশন"—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুমি পথটিকে আলো করে দিলে। আর মনে পড়ে বাঈজীর সেই ঠাট্টাটুকু: "অ্যয়সা খুব্-সুরত নৌজোয়ান, আভিতক মেহবুবা নেহি আয়ী?"

—"নেহি—লেকিন্ ম্যাঁয় তো ইন্তজারমে হুঁ—"

অসম্ভব চিন্তা জেনেও মনটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। চিত্রা সামনে এসে দাঁড়ায়। শোভনের মনে হয় বাঈজীর অভিশাপ ফলতে শুরু করে দিয়েছে।

না, অন্যায়। এ কখনো চলতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু জোর করে কি কেউ ফেরাতে পারে স্রোতকে? আর রাত্রে

ঘুম ভেঙে গেলে জানালা দিয়ে যখন বাগানের যুঁই, রজনীগন্ধার গন্ধ আসে, তখন কি জেগে থাকা স্বপ্নের রেশকে ঠেকানো যায়? ঠেকানো যায় কোনোমতেই?

শুধু একটা অর্থহীন অর্ধচেতনার ঢেউ উঠে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নটাকে ঘা দেয়। যেন মনে হয়, বাইরে শব্দ করে একটা সাইকেল এসে থেমেছে, আর তার কাছে এসে হাজির হয়েছেন অশ্বিনী হালদার।

না—অশ্বিনী হালদার নন। কী একটা পাখি টিন্‌টিন্‌ করে ডেকে চলেছে। কী পাখি শোভন জানে না, বাংলা দেশের সঙ্গে এখনো তার ভালো করে পরিচয় হয়নি।

আট

এদিকে মুকুন্দবাবু প্রায় পাগল করে তুললেন।

—শুনুন, কী করবেন ওটার?

অন্যমনস্ক শোভনের যেন ঘোর ভাঙে।

—কিসের কথা বলছেন?

—চ্যাটার্জি সাহেবের সেই হ্যাণ্ডনোটটা? এর পরে তামাদি হয়ে যাবে যে।

মুখে আসে, হোক তামাদি, চুলোয় যাক পাঁচ হাজার টাকা—কিন্তু মুকুন্দবাবু যেন মূর্তিমান বিবেকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন সামনে। বলাই দাসকে ডেকে এনে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু মুকুন্দ মাইতি সামনে এলেই মনে হয়—কোথায় যেন কী একটা গোপন অপরাধ করে ফেলেছে সে, এই ভদ্রলোক এখনি কড়া করে শাসন করে দেবেন তাকে।

আগ্রার স্কুলের সেই পণ্ডিতজীব মতো। কাঁচা পাকা দাড়ি, গম্ভীর মুখ—স্কুলের বাইরে দেখলেও দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত।

শোভন মাথা চুলকোতে থাকে।

—নালিশই তা হলে করব বলছেন?

মুকুন্দবাবু বিরক্ত হন: আগেই নালিশ করবেন কেন? প্রথমে একটা চিঠি লিখে দিন। যদি তা থেকে টাকাটা মিটিয়ে দেন, তাহলে তো আর কথাই নেই। যদি কিস্তিতে কিস্তিতে দেন, তাতেও ক্ষতি নেই আমাদের। খোলা চিঠি একখানা লিখে ফেলুন।

—কী চিঠি লিখব?

মুকুন্দবাবুর কপাল কুঁচকে ওঠে: বেশ ভালো করেই লিখবেন —ঝগড়ার তো কিছু নেই। টাকা নিয়েছিলেন, ফেরৎ দেবেন।

এমন কিছু অভাব তো ওঁর নেই, দিব্যি 'রাইস মিল' চালাচ্ছেন, লরী কিনেছেন, শুনেছি একটা 'কার'ও বুক করেছেন।

—হুঁ।

—হুঁ নয়।—মুকুন্দবাবু কঠোর হয়ে উঠতে থাকেন : না এভাবে আর সময় নষ্ট করা যায় না। আপনি যদি না পারেন, আমিই বরং মুসাবিদা করে দেব।

শোভন সভয়ে বলে, থাক থাক। যা লিখবার আমিই লিখব এখন।

—তাই লিখুন। কিন্তু দেরী করবেন না।—মুকুন্দবাবু সন্দিগ্ধভাবে শোভনের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ : আর যদি নিজে গুছিয়ে লিখতে না পারেন, তা হলে বরং ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

এই যুক্তিটাই বেশ লাগসই মনে হয় শোভনের। চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে একটা গোলমেলে মামলা মোকর্দমা বাধবার আগে বরং মামার কাছ থেকে কিছুটা পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সুতরাং আবার স্কুটার—সেই পথ পাড়ি দেওয়া, তারপর কলকাতা।

মামার কী কাজে কলেজ থেকে ফিরতে দেরী হয়েছে, ঘর তালা বন্ধ। ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় এল চাকরটা। বললে, যাচ্ছেন কেন বাবু, চাবি আমার কাছেই আছে। আমি ঘর খুলে দিই, আপনি বসুন।

শোভন একা ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইল। খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টালো, কয়েকটা দুর্বোধ্য বইয়ের পাতা খুলে দেখল, তারপর বিরক্ত হয়ে নিজেই স্টোভ ধরিয়ে এক পেয়ালা চা করতে বসে গেল।

—জল নে, জল দে, আমার জন্যেও জল দে।

মামা আলনায় চাদর রেখে বিছানার ওপর ব্যাগটা ছুড়ে দিলেন।

—তোমার দেরী দেখে সেল্‌ফ হেল্‌পে লেগেছি।

—খুব ভালো করেছিস।

জামা খুলে খাটের ওপর বসে মামা মিনিট তিনেক জিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, দাঁড়া, হাত পা ধুয়ে আসি, আর চাকরটাকে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলি।

শোভন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। চিত্রাব সঙ্গে পথেই প্রথম দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু এই ঘরেই তার সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়। মেয়েটি সুন্দবী নয়, কিন্তু আশ্চর্য উজ্জ্বল। পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো শক্ত শরীরের বাঁধুনী, এক সময় হেদুয়ায় সাঁতাব কাটত, শোভনকে বলেছিল, আমি হাতে ধবে আপনাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব। যেদিন সবাই মিলে ওব পোলট্রিটা দেখতে গিয়েছিল—সেই দিনটা যেন সোনা হয়ে আছে মনেব মধ্যে। সেই ছোট্ট নীল রুমালটি প্রাণে ধরে এখনো ফিরিয়ে দিতে পারেনি, যেন ওর সঙ্গে দিনটিও স্থায়ী হয়ে রইল তার ঘরে।

চিত্রাকে কেন এমন অসাধাবণ মনে হয়? বাঁ-গালের ওই কালো জড়ুলটার জন্যে? তাই হবে হয়তো।

—আরে, ওকি করছিস? তোর চায়ের জল যে আকাশের মেঘ হতে চলল।

শোভন লজ্জা পেয়ে জেগে উঠল। কেট্‌লির ভেতরে রেলের এঞ্জিনের মতো শব্দ .উঠছে, নল দিয়ে না ধোঁয়ার স্রোত বেরিয়ে আসছে, ঢাকনাটা নাচতে শুরু করে দিয়েছে। শোভন স্টোভ নিবিয়ে ফেলল, চা ভিজিয়ে দিলে।

খাবারের ঠোঙা হাতে যথানিয়মে চাকরটা পৌঁছে গিয়েছিল। কাপ ধুয়ে সে-ই চা করে দিলে, খাবার সাজিয়ে দিলে, তারপর ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে শোভন বললে, মামা, খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি। অ্যাড্‌ভাইস্ নিতে দৌড়ে এলুম।

—আউট উইথ ইট।

তখন চ্যাটার্জি সাহেবের কাহিনীটা সব শোনাতে হল। সেই হ্যাণ্ডনোটের ব্যাপার, সেই পিতৃবন্ধু, সেই নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো। মুকুন্দবাবু আগেও টাকা পয়সা নেওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত ইঙ্গিত করেছেন, তা-ও বলতে হল। এমনকি বলাই বাবু হাটে কাকে কী বলেছিলেন তা-ও মামার অজানা রইল না। শুধু আড়ালে রইল অনীতা, এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না শোভনের।

মামা একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা হলে আর কি! চক্ষুলজ্জার পাট যখন মিটেইছে, তখন চিঠি দে। টাকা না পেলে উকিলের চিঠি।

—কিন্তু হাজার হোক, বাবার বন্ধু—

মামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললেন, শৈলেশের কোন বন্ধু থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাসই করি না। সে-রকম চরিত্রের লোকই ছিল না সে। আব যদি কোন বন্ধু তাব থাকেই, সে-ও তারই মতো একটা—মামা থেমে গেলেন।

কিছুদিন আগে এস ব্যানার্জিকে যে কোনো নিঃসম্পর্ক মানুষের মতোই ঘৃণা করেছে শোভন। হয়তো বেশিই করেছে। কিন্তু তাঁর ছবি, তাঁর বই পত্র, তাঁর অনুতপ্ত চিঠির লাইনগুলো বার বাব মনে পড়া, মুকুন্দবাবুর মুখে সেই আপনভোলা মানুষটার কাহিনী, শ্রীধরের সেই উচ্ছ্বাস: ইউ রিমাইণ্ড মী শৈলেশ ইন হিজ ইয়ঙ্গার ডেজ—সব মিলিয়ে যেন অনেকখানি কোমল হয়ে এসেছিল শোভন। একটু চুপ করে রইল।

— যদি টাকা না দেন—

—আদায় করতে হবে।

—আবার খানিক বিশ্রী মামলা-টামলা—

—সম্পত্তি থাকলেই মামলা থাকে। অ্যাভয়েড করবার জো নেই।

—তবে—মামা হাসলেন: আমার মনে হয় না, অতটা গড়াবে। তোর মুখে যতটা শুনেছি, তাতে বিস্তর টাকা পয়সা আছে ভদ্রলোকের। চাইলেই দিয়ে দেবেন।

শোভনের মনে পড়ল, মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, চ্যাটার্জি সাহেব চিরকাল হাত চিৎ করতেই জানেন, উপুড় করা তাঁর কোনোদিনই অভ্যেস নেই। একটা বিব্রত বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে রইল সে।

আরো খানিকটা এলোমেলো গল্পের পর সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তা হলে যাই আজ।

—দাঁড়া। আসল কথাই তোকে বলা হয়নি। ভেরি ইম্পর্ট্যাণ্ট।

শোভন আশ্চর্য হয়ে বসে পড়ল: আবার কী ইম্পর্ট্যাণ্ট কথা তোমার?

—তুই কাস্ট সিস্টেম মানিস?

—কখনো ভেবে দেখিনি।

—তা হলে মানিস না। যাক—বাঁচালি। ও ব্যাপারে আমারও কোনো প্রেজুডিস্ নেই। আচ্ছা, এইবার শেষ কথাটার উত্তর দে। ধর, ব্রাহ্ম—এমন কোনো ভালো পরিবারের সুন্দরী কাল্‌চার্ড মেয়ে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?

—তুমি কী বলছ মামা?

—বল, আপত্তি আছে নাকি?

শোভন হেসে উঠল: মেয়ের বাপের অনেক টাকা আছে তো?

—তা আছে।

—তা হলে মেয়ে বাদ দিয়ে বিয়েটার ব্যবস্থা করো, শ্বশুর পেলেই আমার চলবে। পোল্‌ট্রিটার জন্যে কিছু টাকা দরকার।

—ইয়ার্কি নয় ছোকরা, ভেরি সিরিয়াস।—মামার স্বর গম্ভীর হল।

—কী মতলব তোমার?

—মতলব পরেই বুঝবি না হয়! বল্—বিয়ে করবি কি না?

—রিয়্যালি তুমি কি আমার জন্যে ঘটকালি শুরু করেছ মামা?

—ওরে রাস্কেল, আমি না হলে তোর জন্যে আর কে ঘটকালি করতে যাবে!—মামা আলতো ভাবে শোভনের পিঠে একটা চড় মারলেন: ত্রিসংসারে একটা মামা ছাড়া তোর কেই বা আছে আর!

কথাটা ঠিক। আর মামা এমন করে বললেন যে শোভনের চোখে জল আসতে চাইল।

একটু চুপ করে থেকে শোভন বললে, হাঙ্গামা বাড়িয়ো না মামা। আমার এখন বিয়ে-টিয়ের ঝঞ্ঝাটে আদৌ পা বাড়াতে ইচ্ছে নেই।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আমরা যা ভালো বুঝব তাই করব।

—তাই করো, আমায় আব জ্বালিয়ো না—বলে দাঁড়িয়ে পড়ল শোভন।

—আবার কবে আসবি?—পেছন থেকে মামার ডাক ভেসে এল।

—দেখি কবে সময় হয়!

পথে নেমে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্কুটারে উঠল শোভন। সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মামা কিসের ইঙ্গিত দিলেন একটা? কোন পরিবারের সঙ্গে তার একটা সেট্‌ল্‌ড ম্যারেজের কথা ভাবছেন মামা? মিস্টার কুণ্ডু? ছি-ছি, তাও সম্ভব? কেন রাজী হবেন? তাঁর অনেক টাকা, মস্ত বড়ো ব্যবসা। তা ছাড়া ওঁরা কি ব্রাহ্ম? কই সে-রকম তো কিছু মনে হল না। মামা তো আধপাগল, শোভনেরও পাগল হতে বেশি দেরী নেই দেখা যাচ্ছে।

একটা অনিশ্চয়তা আর উন্মাদনায় দুলতে দুলতে শোভন স্কুটার নিয়ে এগিয়ে চলল।

মাইল দুই এসে সেই চৌরাস্তার মোড়টায় থেমে গেল সে। এখান থেকেই তার অঞ্চলের বাসগুলো ছাড়ে, আরো দু-তিনটে রুটের দিকে যায়। আপাতত সেখানে দারুণ গণ্ডগোল। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে, রাস্তায় সারি সারি নিশ্চল বাস, ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারের দল কোলাহল করছে, পুলিশের একটা ভ্যানও দাঁড়িয়ে।

কলকাতা তাজ্জব জায়গা। কিছু না কিছু একটা লেগেই আছে সব সময়।

ভিড় ঠেলে প্রাইভেট গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল, শোভনও যেতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা জেনে নেওয়ার কৌতূহল সামলাতে পারল না।

—কী হয়েছে মশায় এখানে?

পুলিশের সঙ্গে একজন বাস ড্রাইভারের কী নিয়ে গোলমাল বেধেছিল। সেটা কিছু বেশি দূর গড়ায়। পুলিশের গায়ে নাকি হাত পড়ে। ফলে জন কয়েক ড্রাইভার কণ্ডাক্টারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং এ রুটে আজ আর বাস চলবে না।

বিপন্ন বাসযাত্রীদেব দিকে একটা করুণার দৃষ্টি ফেলে শোভন সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি থমকে গেল এক জায়গায়। ল্যাম্প পোস্টের নীচে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে বাদামী কাগজের একটা প্যাকেট। রোগা, লম্বা, কালো চেহারা। পরনে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, দু-চোখে জলে ডোবা মানুষেব আতঙ্ক।

অনীতা!

একবার দ্বিধা করল শোভন, তারপর সাইকেলটা সরিয়ে আনল অনীতার দিকে।

—নমস্কার।

—নমস্কার।—বিহ্বল হয়ে প্রতিনমস্কার করল অনীতা, মুখে লজ্জার রং পড়ল।

—চিনতে পারছেন আশা করি।

—কী আশ্চর্য, চিনতে পারব না কেন।—অনীতা চোখ নামাল, চেয়ে রইল নিজের বিবর্ণ পুরোনো জুতোটার দিকে।

—এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

—দেখছেন না, কী মুস্কিলে পড়ে গেছি? একটু কাজে এসেছিলুম কলকাতায়—বেরুতে দেরী হল, এখন দেখছি বাসের এই গণ্ডগোল। ফিরব কী করে বুঝতে পারছি না। কটা বেজেছে বলুন তো? ট্রেন পাওয়া যাবে?

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল শোভন। শেষ ট্রেনটা ছাড়তে পনেরো ষোলো মিনিট দেরী আছে এখনো। কিন্তু বাসে ট্রামে গেলে পঁচিশ মিনিটের আগে কিছুতেই পৌঁছুনো যাবে না। এক যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়!

—একটা ট্যাক্সি হলে ধরতে পারেন গাড়ি। কিন্তু পাবেন ট্যাক্সি?

অসম্ভব। কলকাতার ট্যাক্সি এমনিতেই মরীচিকার মতো সুদূর। তারপর, এখানে এই মুহূর্তে যখন সব বন্ধ হয়ে আছে, তখন ট্যাক্সি ধরা আর চাঁদে হাত বাড়ানোর ভেতর কোনো তফাৎ নেই।

শোভন একবার অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। যেন সমুদ্রে তলাচ্ছে।

—কলকাতায় থাকবার জায়গা আছে কোথাও?

—না।

—চেনাশুনো কেউ?

—বিশেষ নয়।

—তা হলে আর দেরী করবেন না। চটপট চলে আসুন।

—কোথায়?—অনীতার চোখ শিউরে উঠল।

—আমার স্কুটারে। যদি লজ্জা না করে উঠে বসতে পারেন, আমি একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি আপনাকে শেষ ট্রেণটা কোনো মতে ধরিয়ে দিতে পারি কি না।

অনীতা কেঁপে উঠল। সাদা হয়ে গেল মুখ।

—না, সে হয় না। আমি পারব না।

—পারবেন না? তবে সারা রাত থাকুন এখানে দাঁড়িয়ে। আর যদি সাহস করে স্কুটারে উঠে বসতে পারেন, তা হলে এক্ষুনি চলে আসুন। আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন, ট্রেন আপনার জন্যে বসে থাকবে না।

অনীতা চুপ করে রইল। শোভন স্কুটারে স্টার্ট দিতে দিতে বললে, আমি চললুম তা হলে, নমস্কার।

—একটু দাঁড়ান।

সমুদ্রে যে ডুবছেই, যে কোন একটা ভেলা তার দরকার। সে ভেলায় সাপ ফণা উঁচিয়ে থাকলেও সে নিরুপায়।

—আসবেন?

—কী করব?

—চাপতে পারবেন? পড়ে যাবেন না তো?

অনীতা একটু হাসল: আমি উঠেছি আগে মোটর সাইকেলে। এক আধটু অভ্যেস আছে।

—ভেরি গুড্। চলে আসুন তা হলে। আপনার প্যাকেটটা দিন, স্কুটারের ব্যাগে রেখে দিচ্ছি।

অনীতার পা তবু সরতে চাইল না—মনের ভেতরে তোলপাড় চলছে! শোভন স্টার্ট নিয়ে বললে, তা হলে সত্যিই কি ট্রেনটা ফেল করতে চান আপনি?

—না-না···

স্কুটার ছুটল স্টেশনের দিকে। সব অবিশ্বাস্য, স্বপ্নের মতো লাগছে! অনীতা পেছনে বসে আছে যথাসম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে, তবু তার চুলের গন্ধ আসছে, শাড়ীর ছোঁয়া লাগছে এসে! কী অদ্ভুত ভাবে দু-জন মানুষ এক সঙ্গে এসে মেলে—কত দূর থেকে কত সহজে কাছে এসে যায়।

অনীতা কী ভাবছিল শোভন জানে না, নিজেরও ভাববার সময় বেশি ছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান এখন। উল্‌কার মতো ছুটে চলল স্কুটার, এক জায়গায় পুলিশে যেন নম্বরও নিলে মনে হল; তবু ট্রাফিকের আলো মেনে দাঁড়াতে হল বার বার এবং শেষ পর্যন্ত স্কুটার যখন স্টেশনে এসে পৌঁছুল, তার দু-মিনিট আগে ট্রেনটা চলে গেছে।

একজন বললে, লাস্ট ট্রেন প্রায়ই পাঁচ সাত মিনিট দেরী করে ছাড়ে, আজ একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। রেল কোম্পানীর মর্জির ব্যাপার মশাই, যেদিন যা ইচ্ছে করে!

একেই বলে বরাত!

শোভন অনীতার দিকে তাকাল। স্কুটারে ছুটে এসেও সমস্ত মুখে টলটল করছে ঘাম।

বিবর্ণ হয়ে গেছে, ভয়ে চোখের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শোভনের মন করুণায় ভরে গেল।

—কি করবেন এখন?

—জানি না।

—কারো বাড়ীতে থাকতে পারেন না, না?

—সে রকম আমার কেউ নেই।

চিন্তিত হয়ে শোভন দাঁড়িয়ে রইল। তারও তো কেউ চেনা জানা নেই এখানে। মামার মেস আছে, কিন্তু সেখানে কোথায় থাকবে অনীতা? এক চিত্রাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া চলে, তাদের ওখানে জায়গাও আছে, কিন্তু না—সে অসম্ভব। সে কথা ভাবাই যায় না। কী বলবে তাদের? কী পরিচয় দেবে অনীতার? কোনো পরিচয় তার নিজেরই তো ভালো করে জানা নেই এখনে।।

একটা চুরুট ধরিয়ে কিছুক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলে শোভন। অনীতা চুণের দাগ ধরা আর ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল লাগানো একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিথর হয়ে।

শোভন বললে, একটা উপায় হতে পারে। স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে কথা কয়ে রাত্রে যদি স্টেশনের ওয়েটিংরুমে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিই আপনার জন্যে?

অনীতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল: না, সে আমি থাকতে পারব না।

—তাই তো!

—তা ছাড়া আজ রাত্রেই যদি ফিরে না যাই, তা হলে—কথাটা শেষ করল না, একটা অতলান্ত ভয় দুলে উঠল গলার স্বরে।

শোভনের মনে পড়ল অশ্বিনী হালদারের কথা: মেয়েটার বাঁচা দরকার।

শোভন বললে, তা হলে আসুন। দু-মাইল পথ যে-ভাবে এসেছেন, সেই ভাবেই ত্রিশ মাইল পাড়ি দেওয়া যাক।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনীতা। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়তে লাগল তার।

শোভন বললে, একটা প্রশ্ন নিশ্চয় আছে। আপনি বলতে গেলে আমাকে এক রকম চেনেনই না। তার ওপর রাত হয়ে গেছে, এক ঘণ্টারও বেশি রাস্তা। আমাকে বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাহস করে যদি আসতে পারেন, আমার দিক থেকে যথাসম্ভব—

—কিছু বলবার দরকার নেই। আপনাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। বেশি দেখিনি, কিন্তু অনেক শুনেছি। বিশ্বাসের অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই—অশ্বিনী কাকা আপনার দস্তুর মতো ভক্ত! —এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা যেন জোর করে বলে ফেলল অনীতা, তারপর শাড়ীর আঁচলে ঘামে ভেজা মুখটা মুছে ফেলল।

—কী করবেন তা হলে?

—চলুন।—একটা নিষ্প্রাণ নিবন্ত গলা শোনা গেল: যদি দেখা যায়, বাসের গোলমাল এর মধ্যে মিটে গেছে, তা হলে—

—তা হলে তো কথাই নেই। আসুন।

আবার স্কুটার। সেই ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনীতার বসে থাকা। বাতাসে চুলের হালকা গন্ধ। উড়ন্ত শাড়ীর আঁচলের ছোঁয়া।

কিন্তু বাস পাওয়া গেল না। সেই সারি সারি নিশ্চল গাড়ী। ছাড়া ছাড়া জনতা। এখনো ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারদের ভেতরে উত্তেজিত আলোচনা এখানে ওখানে। বাসের যাত্রীদের আর বিশেষ দেখা গেল না, অবস্থা বুঝে যে যেমন পারে ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

শোভন একবার স্কুটার থামালো।

—বাস আজ আর ছাড়বে না?

কোনো জবাব এল না। এমন অনেক আকুল প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারা ক্লান্ত।

শোভন একবার ফিরে চাইল অনীতার দিকে। স্থির হয়ে বসে আছে—চোখের দৃষ্টি শূন্য। যেন একটা প্রার্থনার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে, যেন শক্তি আর সাহস চাইছে দেবতার কাছে।

দেবতার দরকার নেই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি।—মনে মনে উচ্চারণ করল শোভন। তারপর দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে দিলে স্কুটার।

ভাগ্য—! ভাগ্য দু-জন অচেনা মানুষকে কী আশ্চর্যভাবেই মিলিয়ে দেয়।

ভাগ্য মিলিয়ে দেয়। অন্ধকার পথে, দূরের যাত্রায় বিশ্বাস আর নির্ভরতার অপূর্ব আর অবিশ্বাস্য সান্নিধ্যে।

ছুটতে ছুটতে মনে হচ্ছিল, কত কাছে কত দূরের একটি মানুষকে বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি লম্বা কালো মেয়ে নয়, রূপসী নয়—বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের পথে ঘাটে দেখা চিরকালেব চেনা মেয়েদেরই একজন। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই—দু'বার তার দিকে ফিরে ফিরে চাইবার মতো কৌতূহল কারো কোনদিন জাগে না। অথচ শোভন অনুভব করছিল সেই একটি অতি সাধাবণ অল্প-শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে একদা দুর্বোধ্য মনকে বয়ে নিয়ে চলেছে সে। তার শাড়ীর ছোঁয়া লাগে, কিন্তু মনটার কোনো সন্ধান মেলে না।

ভীড়, গঞ্জ, বাজাব। লেভেল্ ক্রসিং। কখনো গাছপালার কোলে ঝিমিয়ে আসা রাত, কখনো জলার গন্ধ, কখনো বা মাঠের ওপর একটা পাতলা কালো সিল্কের ওড়নার মতো কাঁপতে থাকা অন্ধকাব। আকাশে জ্বলজ্বলে তারাব সাব।

শ্রীধর বলেছিলেন, আশ্রিতা একটি মেয়ে—তা 'কুক্-ই' বলতে পারো। অশ্বিনীর চোখে আগুন ছুটেছিল সে কথা শুনে। অনেক বছর ধবে তিনি এদের জানেন, এই মেয়েটিকে জানেন। সব কথা তিনি বলতে চান না, শুধু মেয়েটিকে একটুখানি বাঁচার সুযোগ করে দিক শোভন এইটুকু তাঁর নিবেদন। একটা কথা, কিন্তু অনেক কথার ইঙ্গিত তার ভেতরে।

শোভন কতটুকু জানে? কিছুই নয়। সেই থেমে যাওয়া বেহালা। সেই বিকেলে যেন হঠাৎ অস্বাভাবিক আতঙ্কেই অনীতার ছুটে পালানো।

অনেক কথা। কিন্তু সব একটা বন্ধ দুয়ারের ওপারে থমকে থেমে আছে মনে হয়।

সেই রাত্রে—সেই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রাত্রিতে, মাত্র কয়েকটা কথা হয়েছিল অনীতার সঙ্গে। একটা পেট্রোল পাম্পে তেল নেবার সময়

—কলকাতায় বুঝি মার্কেটিঙে গিয়েছিলেন?

একটু চুপ করে থেকেছিল অনীতা। জবাব দিয়েছিল, সে কিছু নয়। অন্য কাজ ছিল একটা। ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলুম।

—ইণ্টারভিউ!—আবার অশ্বিনীর কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। অনীতা তা হলে সত্যিই চাকরির চেষ্টা করছে। অথচ, অশ্বিনী তাকে বলে যাওয়ার পর এই প্রায় মাস খানেকের ভেতরে কথাটাকে সে এতটুকু গুরুত্ব দেয় নি। অপরাধীর মতো জিজ্ঞেস করেছিল, কিসের ইণ্টারভিউ?

—একটা নার্সিংয়ের।

—কাকাবাবু আসতে দিলেন?

কথাটা আন্দাজেই জিজ্ঞেস করা। এই সংশয়টুকু প্রকাশ করবার সুযোগ অশ্বিনীই দিয়েছিলেন তাকে।

অনীতা আর্ত চোখে শোভনের দিকে তাকালো একবার। কতটা সে জানে? কী জানে?

—কাকাবাবুকে জানাইনি—অনীতা আবার মাথা নামিয়ে নিলে: ওঁকে বলেছিলুম, চোখটায় কদিন ধরে জল পড়ছে, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, একবার দেখিয়ে আনব। উনি একটা চিঠিও দিয়েছিলেন চেনা ডাক্তারকে।

—চোখ তা হলে সত্যি খারাপ নয়।

জমাট মেঘের ভেতর থেকে আলোর মতো হাসি দেখা দিয়েছিল এক টুকরো: না। মিথ্যে কথা বলেছি।

—সব মিথ্যে অন্যায় হয় না—শোভনও যেন অনেকটা সহজ হতে পেরেছিল এতক্ষণে: তা নার্সিংয়ের খবর কী।

—চল্লিশ জনের সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলুম।

—আশা আছে কিছু?

—জানি না।

তেল নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, স্কুটার আবার ছুটল। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আবার মনে আসতে লাগল: মেরে সাথ তুম্‌নে আ কর্‌ রাহ্‌ কর্‌ দী বোশন—

আর মনে হচ্ছিল, স্কুটাবেব পেছনে যে বসে আছে সে অনীতা নয়, চিত্রা কুণ্ডু।

ঘোষদীঘির মোড়ে যখন পৌঁছুল রাত তখন সাড়ে দশটা। অনীতা বললে, থাক, এইখানেই আমি নামব।

—বলেন কি! অন্ধকার রাস্তা, অনেকটা যেতে হবে যে।

—আমার অভ্যেস আছে।

—ভয় কববে না?

অনীতা পাংশু হাসি হাসল: ভয় আমার আর কাউকে নেই। থাকলে আপনার স্কুটারে চেপে এভাবে আমি কিছুতেই আসতে পারতুম না। আমি চলি। তা ছাড়া বাস থেকে নামলেও তো এ পথ আমায় হাঁটতেই হত।

—সঙ্গী পেতেন তখন। চলুন, আমি হেঁটেই এগিয়ে দিই খানিকটা।

—কিছু দরকার নেই। ওই তো সামনে মিলের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি চলি। আপনাকে ধন্যবাদ দেব না, দেবার কোনো মানে হয় না।

অনীতা দু-পা এগিয়ে গিয়েছিল, শোভন পেছন থেকে ডাকল: শুনুন?

অনীতা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—পেছু ডাকলুম বলে কিছু মনে করবেন না। ধন্যবাদও চাই না। কিন্তু কথা দিন, একদিন বেহালা শোনাবেন আমাকে।

—চেষ্টা করব।—আবার ক্ষীণ রেখায় হাসল অনীতা, তারপর সাদা একটা ছায়া মূর্তির মতো তরল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। আর শোভন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনতে লাগল দু-ধারের মাঠ থেকে ঝিঁঝির ঝঙ্কার, রাতচরা প্যাঁচার ডাক।

তারপর আবার উল্‌টো মুখে বাড়ী ফিরে আসা। ক্লান্ত উত্তেজিত স্নায়ুর ভেতরে দুটো স্রোতের সংঘর্ষ। মামা কেন বললেন ও-কথা? তুই কাস্ট সিস্টেম মানিস?…ধর, ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্ম—এমন কোন কালচার্ড পরিবারের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোর?

—কী বলতে চান মামা? কিসের ইঙ্গিত?

একটা অসম্ভব সম্ভাবনায় মাথার ভেতর থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়। তবে কি চিত্রা? কেন চিত্রার বাবা রাজী হবেন, শোভনকেই বা পছন্দ করবে কেন চিত্রা? নাকি আর কারো কথা ভাবছেন মামা? তাই সম্ভব। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই তাই।

ভাবতেই শোভনের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। কেন এ সব করতে যাচ্ছেন মামা? কে তাঁকে মাথার দিব্বি দিয়ে বলেছে যে শোভনের জন্য এখুনি তাঁর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার? বিয়ে না হলে কি শোভনের আর ঘুম হচ্ছে না? না—একটু শক্ত হওয়া দরকার, মামার এসব খ্যাপামি তাকে বন্ধ করতেই হবে।

শোভন উঠে বসলো, ঘরের আলো জ্বালল, একটা চুরুট ধরালো।

শোয়ার ঘরের দেওয়ালেও এস, ব্যানার্জির আঁকা কয়েকটা ছবি। একটা মহাভারত থেকে—অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা। সুরূপা চিত্রাঙ্গদা অভিসারিকার বেশে মালা গেঁথে এনেছে অর্জুনের জন্যে, অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়েছে অর্জুন। মহাভারতে কি এমনি ঘটনা আছে কোথাও? না—রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেই বিষয়টা সংগ্রহ করা?

চিত্রাঙ্গদা নয়—তার অনীতাকে মনে পড়ল। ছবির ওই উপেক্ষিতা অভিসারিকার সঙ্গে অনীতার চেহারার যেন মিল আছে। বাবা কী অনীতাকে মডেল করে ছবিটা এঁকে ছিলেন? কিন্তু ছবির নীচে বারো বছর আগেকার তারিখ—তখন কত বয়েস ছিল অনীতার? আট—নয়—দশ?

আজকের সন্ধ্যাটা কী আশ্চর্য। এখনো যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। ত্রিশ মাইল পথ। শাড়ীর ছোঁয়া, চুলের গন্ধ, শরীরের এক আধটা মৃদু স্পর্শ। এত কাছে—অথচ এত দূরে। সামনে যখন দাঁড়ালো, তখনো একটা দিগন্তের ওপারে সে বাস করছে, তাকে চেনা যায় না, জানবার উপায় নেই।

বসে বসেই ভোর হয়ে গেল। পোলট্রির মোরগদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আচ্ছন্নতা ভেঙে গেল শোভনের। জানলার সামনে এসে দেখল। অনীতার বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টির মতো পশ্চিমে শুকতারাটা অস্ত যাচ্ছে।

দুদিন পর রবিবারের সকাল একটা।

শোভন বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল গাছগুলোর তদারক করছিল। কয়েকটা নতুন গোলাপ গাছ এসেছে, তাদের দুটিতে কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। প্রাণ ফুটে উঠছে খুশি হয়ে। চোখে পড়ল কী একটা অচেনা ছোট গাছের পাতায় কয়েকটি প্রজাপতির শুঁয়োপোকা ঘুরছে, পাতা খেয়ে চলেছে কুট কুট করে—দু একদিনের মধ্যেই গুটি বাঁধবে—বেশ বড় হয়েছে ওরা। কী রঙের প্রজাপতি হবে? শুঁয়ো পোকার চেহারা দেখে শোভন অনুমান করতে চেষ্টা করল।

এক ঝাঁক টিয়া উড়ে এসে বসল বাগানের বেড়ার গায়ে মস্ত গাব গাছটার ওপর—অকারণেই চেঁচামেচি শুরু করল। শোভনের মনে হল একদল দেহাতী মেয়ে যেন নিজেদের ভেতরে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। উপমাটা তার ভালো লাগল। ছবি এল দূর পশ্চিমের কোনো গ্রামের—দুটি কিশোরী মেয়ে—হয়তো বা দুই বোন,

মাথায় দুটি কলসী নিয়ে, ধানী রঙের শাড়ী পরে, মাঠের ভেতর দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, একজনের হাতে আবার দড়ি বাঁধা একটা পাটকিলে রঙের ছাগল।

ছবিটা ছিঁড়ে গেল। মোটরের হর্ন। পথ চল্‌তি গাড়ীর নয়, তার বাড়ীর গেটেই।

একটু পেছিয়ে গলা বাড়াতেই শোভন চমকে গেল। মিস্টার কুণ্ডুর গাড়ী।

—কোথায় গেলি হতভাগা?—মামা দরাজ গলায় হাঁক দিলেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল শোভন।

নীল চশমার ভেতর দিয়ে হাসলেন মিস্টার কুণ্ডু।

—ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ, আসুন, আসুন।

—কাজের ক্ষতি করলুম?

—আজ্ঞে না—না, কিসের কাজ? তা ছাড়া আজ তো রবিবার।

চিত্রা বললে, নেমন্তন্ন করবার বিপদ দেখলেন তো? আপনি গেলেন না, কিন্তু আমরা ঠিক এসে হাজির হলুম। এর পরে রোজ আসব।

—আসবেন। আমার সৌভাগ্য।

মনোহর ছুটে এসেছিল। ড্রাইভার গাড়ীর ক্যারিয়ারটা খুলে ধরল। কয়েকটা প্যাকেট সে আনে। মিস্টার কুণ্ডু বললেন, এগুলো ভেতরে নিয়ে যাও।

শোভন বললে, কী এসব?

—কিছু কেক, ফলমূল, মিষ্টি।

—ছি ছি, এ-সব আবার কেন?

মিস্টার কুণ্ডু বললেন, আমি কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, চিত্রার মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—না—না, এ ভারী অন্যায়।

মামা একটা ধমক দিলেন। বললেন, অন্যায় আবার কিরে হতভাগা! আদর করে পাঠিয়েছেন, খুশি হয়ে নিয়ে নে। তোর ভাবনা নেই, আমরাও ভাগ নেব এখন।

চিত্রা বললে, একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। ঘুষ বলতে পারেন।

—ঘুষ?—এবার শোভন সম্পূর্ণভাবে চেয়ে দেখল চিত্রার দিকে। আজকে বাসন্তী রঙের শাড়ী। সকালের রোদে শাড়ী আর গায়ের রঙ একাকার—গালের জড়ুলটি দেখে মনে হল একটি পাহাড়ী মৌমাছি উড়ে বসেছে কনক চাঁপার ওপরে।

চিত্রা বললে, নিশ্চয় ঘুষ। আপনার পুকুর দেখে বাবার লোভ হয়েছে। মাছ ধরতে এসেছেন।

—মাছ ধরতে?—শোভন খুশি হয়ে উঠল: সে তো খুব আনন্দের কথা। আসুন—আসুন।

মিস্টার কুণ্ডু বললেন, উৎসাহ আমাকে আপনার মুকুন্দবাবুই সেদিন দিয়েছেন। বলেছেন, মাছ অনেক আছে, ছিপের ব্যবস্থাও আছে, ধরবার লোকই বিশেষ নেই। আসুন না যে-কোন একদিন। আজকে হঠাৎ—

শোভন বললে, চলুন, চলুন—আগে চা খাওয়া যাক, তার পরে মুকুন্দবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি।

চায়ের জন্যে শোভনের আজ বেশি ভাবনা ছিল না, খাবারের পাহাড় সঙ্গে এসেছিল এঁদের। অতিথিরা বিশেষ খেলেন না, বেরুবার আগেই তাঁরা প্রচুর ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছেন। এর মধ্যে মনোহরের কাছে খবর পেয়ে গোটা তিনেক ছিপ হাতে মুকুন্দ মাইতি পৌঁছে গেলেন। ভদ্রলোকের মাছ ধরার বাতিক আছে—কিছু তৈরী চারও নিয়ে এসেছেন।

ঘাটলার পাশে ছাতিম গাছটার ছায়ায় বসলেন সবাই। মামার মাছ ধরা আসে না—একটু পরেই বিরক্ত হয়ে বললেন,

উঃ—কী ধৈর্য মশাই আপনাদের। আমি বরং চারদিকে ঘুরে আসি একটু।

—বেশি দেরী কোরো না মামা।

—না-না।

ছিপ নিয়ে বসেছেন মিস্টার কুণ্ডু আর মুকুন্দ বাবু। আর একটু ওপরে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে চিত্রা, তার পাশেই শোভন।

—আপনি মাছ ধরতে পারেন না শোভন বাবু?

—না। পশ্চিমে মানুষ হয়েছি। মাছ খেতুমই না প্রায়।

—জানেন, আমাদের ইস্ট্ বেঙ্গলে বাড়ী ছিল। খুব ছোট বেলায় গিয়েছিলুম একবার। দেখেছিলুম, মেঘনায় জাল ফেলে জেলেরা ইলিশ মাছ ধরছে—বোদে চকচক করছে মাছগুলো।

মুকুন্দবাবু ছিপ টানলেন। চিত্রা চিৎকার করে উঠল: মাছ—মাছ!

মাছ উঠেছিল বটে, কিন্তু মুকুন্দবাবু হাসলেন। বললেন, আধ পো ওজনের পোনা! কী হবে? বঁড়শি থেকে খুলে ছেড়ে দিলেন জলের ভেতর।

চিত্রা আর্তনাদ করল; ছেড়ে ছিলেন?

মুকুন্দবাবু অভয় দিয়ে বললেন, হবে—হবে, দাঁড়ান। বিস্তর মাছ আছে পুকুরে।

মাছ উঠল। ঘণ্টা দেড়েকের ভেতরেই দু জনের ছিপে গোটা পাঁচেক মাছ উঠল—সাত আট সেব হবে ওজনে। চিত্রার কলধ্বনিতে ভরে উঠল চারদিক।

—চমৎকার! কী আশ্চর্য! কী সুন্দর দেখতে মাছগুলো!

মামা ফিরে এলেন। তখন বেলা চড়েছে, ছাতিম গাছের ছায়া গুটিয়ে এসেছে, রোদ পড়েছে দুই শিকারীর গায়ে। মামা বললেন, আর কেন—যথেষ্ট হয়েছে। জীব হিংসে করে আর দরকার নেই, উঠে পড়ুন এবার।

মুকুন্দবাবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন।

—একটা মস্ত কাৎলা—প্রায় সের চারেক—চারে এসে গেছে। যদি ওটাকে—

—ওটা আরো বড়ো হোক, সের দশেক হোক, তারপর দেখা যাবে—ছিপ গুটিয়ে নিয়ে মিস্টার কুণ্ডু উঠে পড়লেন।

আর একটা চমৎকার দিন কাটল। আবার চিত্রার খানিকটা তপ্ত সান্নিধ্য। হাসি, গল্প, কৌতুক। তার ভেতরে মামার এক-একটা জটিল তত্ত্ব আলোচনার চেষ্টা। দুপুরের রোদ, চিত্রার কাছে থাকা—নির্ভাবনার আনন্দ, সব মিলিয়ে একটা স্বপ্নের জগৎ।

সেই রাত্রিটা দু-একবার ভেসে গেল ভাবনার ওপর দিয়ে। স্কুটারে করে সে অনীতাকে ঘোষদীঘিতে পৌঁছে দিয়েছিল। সেও আর একটা স্বপ্নের মতো লাগে। কিন্তু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। বিকেলের আলো নেমে আসতে আবার ফিরে যাওয়ার পালা।

তার আগে ছাতিম গাছের ছায়ায়, দুপুরের বেলায়, পুকুরের জলে হাঁসেদের ভেসে বেড়ানো দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ আজও চিত্রার সঙ্গে কেটেছিল শোভনের। মিস্টার কুণ্ডু তখন বিশ্রাম করছিলেন, একটা ডিভানের ওপব মামার নাক ডাকছিল।

কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প চলেছিল, তার বেশি কিছুই নয়। তবু—

তবু চিত্রাকে আজ কোথায় যেন আলাদা মনে হল।

একটা হাঁসের পালক কুড়িয়ে নিয়ে ঘাসের ওপর কী যেন লিখতে চাইছিল চিত্রা। ছাড়া-ছাড়া ভাবে কথা বলছিল, মাঝে মাঝে ভরা চোখে চেয়ে দেখছিল, কখনো বা মাথার চুল, পরনের শাড়ী গুছিয়ে নিচ্ছিল একটুখানি।

—আপনি সত্যিই কি আর আসবেন না আমাদের বাড়ী?

—আসব।

—পরশু?

—না, পরশু নয়। তার পরের দিন।

—সকালে ?

—না বিকেলে।

—কথা রইল ?

—কথা রইল।

মোটর ছাড়বার আগেও কথাটা আর একবার আদায় করে নিলে চিত্রা। মিস্টার কুণ্ডু।

তারপর প্রায় মাসখানেক কাটল। এর মধ্যে আরো তিনবার শোভনকে যেতে হল মিস্টার কুণ্ডুর ওখানে।

দুবার মামা সঙ্গে ছিলেন, শেষের বারে একাই।

বাগানে গোলাপের নতুন গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেল। সেই প্রজাপতিরা কবে কোথায় উড়ে গেল, আবার এল নতুন প্রজাপতির দল।

এর মধ্যে আর অনীতা কোথাও নেই। স্কুটারের সেই সন্ধ্যাটা একটা কালো বুদ্বুদ হয়ে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেছে, তাকে আর ভালো করে মনে করতে পারে না শোভন।

দশ

তবু এর মধ্যে কিছুদিন একটা অস্বস্তি ছিল না। সেই হ্যাণ্ডনোটের কথা।।

মুকুন্দবাবু বোধহয় দিনকতক চুপচাপ থেকে শোভনের হালচাল লক্ষ্য করেছিলেন। শেষে যখন দেখলেন, এভাবে সুবিধে হবে না, তখন আবার কথাটা তুললেন।

—হ্যাণ্ডনোটের কথাটা মনে আছে তো?

—আছে।

—দেরী হলে আবার—

—ভাববেন না আপনি, সব ঠিক আছে।

এ এক অশান্তি। মুকুন্দবাবুদের মতো কর্তব্যপরায়ণ লোক পৃথিবীতে কেন যে জন্মায়! তাতে হয়তো ধর্ম রক্ষা হয়, কিন্তু শান্তি থাকে না। আচ্ছা জ্বালাতেই পড়া গেছে যাহোক।

কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেবকে টাকাটার কথাটা লিখতে কিছুতেই মন সরছিল না। অনেকবার ভেবেছে, তাঁর ওখানে নিজেই একবার যাবে, সামনা সামনি কথাটার আভাস দেবে, তারপর—। কিন্তু স্কুটার নিয়ে ঘোষদীঘির মোড় পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছে। হয়তো ভয়টা চ্যাটার্জি সাহেবকেও নয়। অনীতার মুখোমুখি দাঁড়াতেই কেমন সংকোচ হচ্ছে তার।

কী ভাববে অনীতা? টাকার তাগাদা দিতে এসেছে কাবুলীওয়ালার মতো?

কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেবের এই কুকটির সম্পর্কেই বা এত সংকোচ কেন তার। কে এ, যার জন্যে এত লজ্জিত হচ্ছে শোভন? কলকাতায়

গিয়ে বিপদে পড়েছিল, সে দয়া করে তাকে স্কুটারে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সে জন্যে কেন তার এ-রকম দ্বিধাই বা কেন?

মুকুন্দবাবু ঘরে এলেন। শোভন কুঁকড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বিরস দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে বিনা সম্ভাষণেই চেয়ার টেনে বসে পড়লেন মুকুন্দ। মনে হল, অনেকদিন ধৈর্য ধরে আজ তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প। জড়তাহীন স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, টাকার ব্যাপারে ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন?

ঢোক গিলে বলতে হল: করেছিলুম।

—কী বললেন?

—প্রথমে একটা সাধারণ চিঠি দিতে বললেন—অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিতে হল: পরে দরকার হলে—।

মুকুন্দবাবু বললেন, বেশ লিখে ফেলুন। আর দেরি করা যায় না।

—আজই?

—এখুনি!

নিজেই প্যাড আর কলমটা সরিয়ে দিলে শোভনের দিকে।

আর উপায় নেই। শোভন একবার কাতর দৃষ্টিতে মুকুন্দবাবুর দিকে চাইল! ভদ্রলোক এবার সস্নেহ হাসি হাসলেন একটু।

—বুঝেছি, খুব ডেলিকেট মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করা যায়—এতগুলো টাকা।

—টাকা আমি চাই না।—মরিয়া হয়ে জবাব দিলে শোভন।

—আপনি না চাইতে পারেন—মুকুন্দবাবুর স্বর শক্ত হয়ে উঠল: টাকাটা ফার্মের। ওটা ছাড়া যায় না। আপনার পার্সোনাল লোন হলে কিছুই বলতুম না আমি।

ফার্ম। মুকুন্দবাবুর বুকের পাঁজরা। কোনো কথা নেই সেখানে। মুকুন্দবাবু বললেন, ড্রাফট আমি করেই এনেছি, এই দেখে লিখে ফেলুন।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ ফেলে দিলেন টেবিলে।

চালাক লোক, বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। সেইটেই এক আধটু শুধরে দিতে হল তাকে। সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে, কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না তার।

চিঠিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন মুকুন্দবাবু। বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার?

—বলুন।

—রাগ করবেন না?

—রাগের প্রশ্ন কেন আসছে?

একটু ইতস্তত করলেন মুকুন্দ: আচ্ছা, মাসখানেক আগে যে আপনি কলকাতা গিয়েছিলেন—

শোভন চমকে উঠল: তা কী হয়েছে?

—ফেরবার সময় একাই এসেছিলেন কি?

—কোনবারের কথা বলছেন আপনি?

—মানে কোনোবার কি কাউকে—

শোভন শব্দ করে নড়ে উঠল চেয়ারটায়—একথার অর্থ কী?

—অর্থ কিছুই নয়—মানে একটা আলোচনা কানে এল।

—আলোচনা? কিসের আলোচনা?—শোভনের রক্ত দুলে উঠল, সমস্ত ইঙ্গিতটা একই দিকে এগিয়ে আসছে। অনীতাকে লিফট দেওয়া?

মুকুন্দবাবু বললেন, থাক, পরে বলব।

—না ,এখুনি বলুন।—শোভনের গলা শক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বলবার সুযোগ পেলেন না মুকুন্দ বাবু। বাড়ী কাঁপিয়ে ডাক উঠল: শোভন, এই হতচ্ছাড়া শোভন—

মামার গলা।

শোভন লাফিয়ে উঠল: মামা, এসো-এসো।—সঙ্গে সঙ্গে চোখ চলে গেল বাইরে। না, সেই নতুন গাড়ীটা দাঁড়িয়ে নেই, নীল শাড়ীর আঁচলটা কোথাও নেই, মিস্টার কুণ্ডুকেও দেখা গেল না।

নিরাশ হয়ে শোভন বললে, একা নাকি ?

—খুব মন খারাপ হয়ে গেল তো ?—মামা হা হা করে হেসে উঠলেন : হবে, হবে। —ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে : তারপর, খবর কি মাইতি মশায় ? সব ভালো তো ?

—আজ্ঞে হাঁ, একরকম চলছে আপনার আশীর্বাদে। আপনি ভালো ? মুকুন্দবাবু বিনীত হাসিতে জবাব দিলেন।

—আমি সব সময় ভালোই থাকি।

দু-চারটে খুচরো কথার পর মুকুন্দ বিদায় নিলেন। মনোহরকে চা আনতে বলে দিয়ে শোভন জিজ্ঞেস করলে : এলে কিসে ?

ছড়া কেটে মামা বললেন : কেন, বাসে চাপিলাম, এসে নামিলাম !

—খুব মুড়ে আছো দেখছি যে।

—কেন থাক্‌ব না ? তোর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি যে ! সেই অনেকদিন আগে একবার বলেছিলুম, মনে নেই ?

—মামা—কী করছ ?

—থাম তুই ! বত্রিশ বছর বয়েস হল, অরক্ষণীয় হয়ে থাকবি নাকি এখনো ? লোকে কি বলবে তোকে ? আর আমিই বা কী কৈফিয়ৎ দেব সকলের কাছে, তাই বল ?

—কিন্তু পাত্রীটি কে ?—জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার।

—জানবি পরে। আজ রাতে তোর এখানেই তো থাকব। সব শুনবি।

সন্ধ্যা নামল। আজকে অন্ধকার নয়, চাঁদের একটা উজ্জ্বল টুকরো চোখ মেলেছে আকাশে। হালকা আলোর ঢেউ দুলছে মাঠে, কাঁপছে বাগানের গাছপালায়, রজনীগন্ধার কলিগুলো যেন উন্মুখ হয়ে আছে। সেই বেদী, দু পেয়ালা চা, আর বাতাস আর—

—চিত্রা তোকে পছন্দ করে।

—মামা !

—হুঁ হুঁ, ফিলসফি পড়ালে কী হয়, এখনো বুঝতে পারি এক আধটু। ভনিতা তো করতে জানি না, সোজাসুজি বললুম, আমার খ্যাপা ভাগ্নেটাকে এবার সংসারী করতে চাই। তোমার মত একটি মেয়ে পেলে বেশ হত। মুখ লাল করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে, বললে, 'আমি যাই'। তারপর আমি ওর বাবার কাছে প্রস্তাবটা করে ফেললুম।

শোভন নিথর হয়ে বসে রইল।

—সত্যি কথা বলতে কি, একটু শক্‌ড হলেন যেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'কিন্তু আমরা তো আপনাদের জাত নই, তার ওপর আমার বাবা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন'। জবাব দিলুম 'ও সব আমরা মানি না। কিন্তু আপনি ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে যাবেন না?' উত্তরে বললেন, 'না, সে রেষ্ট্রিক্‌শন কিছু নেই, তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা কইব। তা ছাড়া মেয়েটা অন্ততঃ গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত বিয়েটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। বরং পরে কথা কইব আপনার সঙ্গে। মনটা খারাপ হল, বুঝতে পারলুম, এ পর্ব এখানেই খতম। এ রকম একটা পাগলামির প্রস্তাব না আনলেই হত, বিশেষ করে ওরা বড়-লোক। তারপর কাল দুপুরে কলেজে ফোন এল: 'দয়া করে সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন ডক্টর ঘোষাল, কথা আছে।' গেলুম। নানা আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো তা এই। মেয়ের তোকে পছন্দ। এই বাগান, এই বাড়ীও তার দারুণ ভালো লেগেছে। কিন্তু মিস্টার কুণ্ডু বলেছেন, বিয়ের পরে দু'জনকেই ইয়োরোপে পাঠাবেন। তুই পোলট্রি আর ফার্মিং পড়ে আসবি, আর চিত্রা যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাবে।

রূপকথা! একটা গল্প যেন তৈরী হচ্ছে তাকে ঘিরে। তার মনের কতগুলো খেয়ালী চিন্তা যে এমন করে কোনোদিন সত্যি হয়ে উঠতে পারে, স্বপ্নেও কি কেউ সে কথা ভাবতে পেরেছিল কোনোদিন।

—কিরে, কথা বলছিস না যে?

শোভন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অস্পষ্ট গলায় বললে, এখনো যেন ঠিক বুঝতে পারছি না মামা। সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত আন্‌রিয়াল মনে হচ্ছে আমার।

—যা আন্‌রিয়াল তা-ই রিযাল হয়ে উঠবে।—মামা শব্দ করে ভাগনের পিঠ চাপড়ে দিলেন : চিয়ার আপ মাই বয়, চিয়ার আপ!

শুধু সামনের আকাশের চাঁদটা সকৌতুকে চেয়ে রইল মুখের দিকে। আর বাতাসে একটা গন্ধের ঝলক এসে মুখে পড়ল, মনে হল, সেই রাত্রে স্কুটারে আসতে আসতে অনীতার মৃদু-সুরভিত স্পর্শ, তার এক একটা আঁচলের ছোঁয়া।

কিন্তু কী বলছিলেন মুকুন্দবাবু? কিসের আভাস দিচ্ছিলেন তখন?

চাঁদের ওপর মেঘের ছায়া পড়ল কোথা থেকে। খুব খুশি হওয়া উচিত, তবু শোভন উৎসাহ পাচ্ছে না।

ঠিক কথা, স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

চিত্রার সঙ্গে তার বিয়ের যোগাযোগটা এতই আকস্মিক যে কিছুতেই মনের দিক থেকে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। মামার উৎসাহী ঘটকালির জন্যেই ব্যাপারটা একলাফে এতখানি এগিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ যে কী করে সম্ভব এখনো ভেবে পাওয়া শক্ত।

যে 'খবসুরৎ নওজয়ান'—হয়তো বাঈজী বাড়িয়ে বলেনি কথাটা। ব্যাস, তারপর? কী আছে তার যে মিস্টার কুণ্ডু তাকে জামাই করতে রাজী হলেন? একটা পোলট্রি ফার্ম, কিছু জমিজমা? সেদিক থেকে তাকে মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সে তো বরাবর বিদেশে কাটিয়েছে, তার সম্বন্ধেই বা তিনি কতটুকু জানেন? মামার সার্টিফিকেট? একজন ব্যবসায়ী মানুষকে কি অত সহজেই ভোলানো চলে?

তা হলে চিত্রা। আর মামাও সেই ইঙ্গিতটাই দিয়েছেন।

কিন্তু চিত্রার সঙ্গেই বা তার কতটুকু চেনা? দু-বার তার এখানে আসা, বার তিনেক মামার ওখানে যাওয়া-আসা, কয়েকবার তাদের বাড়ীতে যাতায়াত—ওইটুকুই। উর্দু কবিতার কল্পনায় সে মনে মনে চিত্রাকে নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছে তা ঠিক, অন্ধকার পথে চলতি স্কুটারে কিংবা বাগানের ফুলের গন্ধভরা একলা সন্ধ্যায় অনেক গজল গানের ছেঁড়া ছেঁড়া লাইনের সঙ্গে ওই মেয়েটিকে সে মিলিয়েও নিয়েছে, কিন্তু সে-সব তো চিত্রার জানবার কথা নয়।

'খবসুরৎ নওজোয়ান' এই পোলট্রি—এই বাংলো, এই বাগানের রোম্যান্টিক আবহাওয়া? অর্থাৎ বাইরের রূপ আর শিল্পী এস,

ব্যানার্জির ছবির ভেতর দিয়ে চিত্রা শোভনকে দেখছে, সেখানে সে পুরো মানুষটা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সত্যও নয়।

ধরা যাক, বিয়েটা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর যখন ছবির রং মুছে গেল, নিজের মনের আবরণ সরিয়ে চিত্রা শোভনকে দেখল, জানল শিল্পী শৈলেশ্বরের ভেতরকার কাহিনী, তখনও এই ভালো লাগাটা তার থাকবে? তার ওপর বড়োলোকের মেয়েকে দিন কাটাতে হবে এই মধ্যবিত্তের সংসারে; তখন আর মোটর থাকবে না, কয়েকঘণ্টা কোন গল্প কিংবা মাছ ধরার আনন্দ থাকবে না, টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার থাকবে না।

চলন্ত স্কুটারে যেতে যেতে শোভনের মনে পড়ল: একবার দল বেঁধে মোটর নিয়ে তাদের পিকনিকে যাওয়া। ঝুরি নামা মস্ত মস্ত দু-তিনটে বটগাছ, একটা পুরোনো পোড়ো মসজিদ, সামনে নদী। দিনটা চমৎকার কেটে গিয়েছিল, একটা বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভাবুক বন্ধু রামপ্রতাপ বলেছিল, আর ঘরে ফিরে কি হবে? 'দিল উদাস হো গিয়া—একদম সাধুবাবা বন্‌কর হিঁয়াই মঁ্যায় ঠহ্‌র যাউঙ্গা।'

কথাটা তখন কানে খারাপ লাগেনি। বটগাছের ডালে তখন টিয়ার টেঁচামেচি, মুনিয়ার ঝাঁক উড়ে পড়ছিল এদিক-ওদিক, হাওয়ায় বটের লাল ফল টুপটুপ করে ঝরছিল, পুরোনো মসজিদটা ছায়ার তলায় শান্ত করুণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নদীর ওপারে ময়ূর চরতে দেখা যাচ্ছিল, আর কী একটা অচেনা পাখি এমনভাবে ডাকছিল যে মনে হচ্ছিল একটানা বলে চলেছে—'খোদা মেহেরবান, খোদা মেহেরবান—'

তারপর সন্ধ্যে হল। বটের ছায়ায় ছায়ায় জোনাকি জ্বলতে লাগল, সেই জোনাকির আলোয় পুরোনো মসজিদটার হা-হা করা অন্ধকারে যেন হাজার হাজার অশরীরীর চোখ জেগে উঠল, বাতাস থেমে গেল, আর ঠিক তখন মোটরের স্টার্টও বন্ধ হয়ে গেল।

তখন রামপ্রতাপই ভয় পেয়েছিল সব চেয়ে বেশি।

'ভাই, জলদি কোই উপায় করো, নেহি তো হার্ট একদম ফেল হো যায় গা।'

আর একজন রসান দিয়ে বলেছিল, 'ইধারমে দো-চার লক্কড়ভি আনা-যানা—'

'হে রাম—' দুহাতে রামপ্রতাপ জড়িয়ে ধরেছিল শোভনকেই।

ভাগ্যিস, মোটরটা একটু পরেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, না হলে সাধু হবার আগেই রামপ্রতাপ মোক্ষ লাভ করত। ব্যাপারটা হালকা, কিন্তু মনে পড়েও শোভন হাসতে পারল না। কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এই বাংলোয় পিকনিকের আবহাওয়া হয়ত ভালোই জমে, দু-মাস ছ-মাস একভাবে হয়তো কেটেও যাবে। কিন্তু কলকাতা নেই, চেনা সমাজ নেই, অভ্যস্ত জীবন নেই, মাঠ, বাস-লরীর শব্দ, ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা রাত, পোলট্রির এক ঘেয়ে দিনের হিসেব—তখন? তখন কেমন লাগবে চিত্রার?

মিস্টার কুণ্ডু তাকে ইউরোপে পাঠাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাকেও সাধ্যমতো কুলীন করে জাতে তুলে নেবেন। তখন মামার সামনে কিছু বলা যায়নি, কিন্তু এইখানেই আবার সব জিনিসটা কেমন বেসুরো মনে হল তার। মিস্টার কুণ্ডু তাকে অনুগ্রহ করতে চান। সে অনুগ্রহ কেন নিতে যাবে শোভন? কেন সে যেমন আছে, তেমনি ভাবেই তাকে স্বীকার করা যাবে না?

বিলেত থেকে ফিরে এসে কী হবে সে? শ্বশুরের কৃপায় ধন্য? তাঁর ঘর জামাই?

শোভনের মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। কিন্তু তবুও যতটা রাগ তার করা উচিত, তা সে কিছুতেই করতে পারল না। চিত্রা। চিত্রার তাকে ভালো লাগে।

সব যুক্তি, সব তর্ক, নিজের মনের ভেতর উগ্র প্রতিবাদ—ওই একটি

জায়গাতে এসে শান্ত হয়ে যায়, যেমন করে দুপুরের রোদ বটের ছায়ায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু—

কিন্তু এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আরো ভাবতে হবে জিনিসটা।

আর ভাবতে গিয়েই শোভন দেখল, সে স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে।

কোনো দরকার ছিল না, তবু স্কুটার থামিয়ে সে নেমে পড়ল। রেল-স্টেশন তার ভালো লাগে। বিশেষ কবে ছোট ছোট স্টেশন—যেখানে ভাড়া কম, বিশ্রাম বেশি। ছেলেবেলায় এমনি কোনো একটা নিরালা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হওয়ার স্বপ্ন তার ছিল।

কিছুক্ষণ ঘুরল প্ল্যাটফর্মে, দেখল একটা বেঞ্চির ওপর পুঁটলি মাথায় নিশ্চিন্ত একজন ঘুমন্ত মানুষ, তারপর মনে হল, চায়ের স্টল থেকে এক পেয়ালা চা খেলে মন্দ হয় না।

বুনো গন্ধওলা চা খেতে খেতে, লাল ফুলে ভরা একটা গাছের মাথায় শালিকের বাসা বাঁধা দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কাটল, অনিশ্চিত চিন্তাগুলো চাপা পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল অনীতাকে।

—এই যে, আপনি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত মুখের রং নিবে গেল অনীতার।

—না—এমনি—একটা কাজে—

—খুব তাড়া যদি না থাকে, আপনাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারি এদের স্টলে। খেয়েছেন কখনো? এখন আশ্চর্য স্বাদ-গন্ধ জীবনে পাননি, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।—শোভন লঘু হতে চেষ্টা করল: আসুন না!

—মাপ করবেন, আমি—আমি—মাঝপথেই অদ্ভুতভাবে কথাটা থামিয়ে দিলে অনীতা। তারপর প্রায় ছুটে গিয়েই সামনের একটা সাইকেল-রিক্‌শায় উঠে পড়ে বললে, চলো।

শোভন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুৎ বাবুর কথাটা মনে হল, মনে হল সেদিন অনীতাকে সেই লিফ্‌ট দেওয়ার সঙ্গে এর কোথাও একটা কোনো সম্পর্ক আছে।

চুলোয় যাক এ-সব, বাংলা দেশের লোকগুলোই এই রকম।

বিরক্ত হয়ে একটা চুরুট ধরাতে গিয়ে তার গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল। তারপর স্কুটারে উঠে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে দিলে সেটাকে।

বারো

সেই সব অস্বস্তিকর ভাবনা, অনিশ্চয়তা, কিছুটা বিরক্তি, আবার তারই মাঝে মনের ভেতরে নানা স্বপ্নের আসা-যাওয়া। আশ্চর্য, চিত্রা আসছে তার জীবনে। সামান্য দেখা, এতটুকু আলাপ, গভীর পরিচয়ের সুযোগ পর্যন্ত হল না, অথচ মামা সোজাসুজি বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। এ যেন বাঙালী পরিবারেব চিরকালের ইতিহাস; বিয়ের প্রস্তাব উঠল, পাত্র-পাত্রী পছন্দ হল, এইবার সাত পাকে ঘুরিয়ে দিলেই হয়।

মামা প্রাচীনপন্থী লোক। পূর্বরাগ অনুরাগের গণ্ডগোল বোঝেন না, শুরুতেই বখেড়া মিটিয়ে দিয়েছেন। একেবারে দেনাপাওনার হিসেব পর্যন্ত। ভাগ্নেকে বিলেত পাঠাবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত হয়ে গেল।

তবু সেই প্রশ্ন।

চিত্রা কেন রাজী হল? কী দেখেছে তার ভেতরে? মোহ? আর মোহ যখন কাটবে তখন?

অথচ নিজের পরিচয় বলতে তো কিছু নেই। শৈলেশ্বর ব্যানার্জি একদা হয়তো জমিদার ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাস তো গৌরবের নয়। আর মা। না—মার কথা সে আব ভাবতেও পারে না, তা হলে তার আর মাথা ঠিক থাকে না।

রূপকথাই বটে।

'আয়েগী, মহ্‌বুবা আ জায়েগী'—বাঈজী বলেছিল।

কিন্তু এলেই কি নিতে পারে মহ্‌বুবাকে? নেওয়া উচিত? চিত্রা কতদিন তাকে সহ্য করবে? শেষ পর্যন্ত সে ঘরজামাই হতে যাচ্ছে নাকি? ভাবতে ভাবতে মাথাটা যেন তালগোল পাকিয়ে যায়।

কিন্তু মুকুন্দবাবু কী বলতে চাইছিলেন সেদিন ?

জিজ্ঞেস করতে কেমন দ্বিধা হয়। সেই রাত্রিটা। স্কুটারের পেছনে ছায়ার মতো মেয়েটি। তাকে জানা যায় না, বোঝা যায় না, যেন একটা অতল সমুদ্রের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। কী ভাবছিল শোভনের মনে নেই, কিছু ভাবছিল কিনা, তা-ও মনে নেই, সব যেন একটা অপরূপ অনুভূতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

অথচ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন মুকুন্দ মাইতি ?

হয়ত সেই রাত্রে কেউ তাদের স্কুটারে আসতে দেখে থাকবে। তাই নিয়ে এক-আধটু গাল-গল্প তৈরি করাও খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু ঠিক কী হয়েছে, কেনই বা মুকুন্দবাবু ওভাবে বলতে বলতে থেমে গেলেন, এই চিন্তাটাই কাঁটা হয়ে বিঁধছে মনের ভেতর।

আর সেদিন স্টেশনে। যেন দেখেও দেখতে চাইল না অনীতা ? কেন অমন করে পালিয়ে গেল সামনে থেকে ? দূর হোক !

মনোহর চিঠি নিয়ে এল।

পড়তে পড়তে হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল শোভনের।

মামার চিঠি। মাত্র গুটিকয়েক লাইন।

'পরশু, মানে রবিবার সবাই আসছি আবার। খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ ব্যবস্থা রাখিস, জানিসই তো এ যাত্রা ব্যাপারটা একটু আলাদা। সামনে সব কথা হবে।'

সবাই কথাটার নীচে লাল কালির দাগ টানা। অর্থটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

আবার ঝড় উঠল হৃৎপিণ্ডে, রক্তে মাতলামি জাগল, তারপর সব থিতিয়ে গেল সেই নেশাভরা স্বপ্নের মধ্যে। যুক্তি রইল না, তর্ক রইল না, প্রতিবাদ রইল না। কেবল একটি সুরই বাজতে লাগল : 'মেরে জিন্দ্‌গী আন্ধেরে মেঁ—'

মুকুন্দবাবু দরজার সামনে এলেন একবার। শোভন টেরও পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত: করলেন ভদ্রলোক, তারপর

নিঃশব্দে ফিরে গেলেন আবার। আজও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বলা হল না।

সেই গাড়ীটা এসে থামল। সেই বড়ো গাড়ীটা।

মামা নামলেন, মিস্টার কুণ্ডু নেমে এলেন। চকিতের জন্যে উৎসুক আকুল দৃষ্টি একবার ঘুরে গেল শোভনের। না—চিত্রা আসেনি। আজো আসেনি।

শোভনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল মামার ঠোঁটের কোণায়। তাঁর চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে শোভন এগিয়ে গেল মিস্টার কুণ্ডুর দিকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাঁর।

সস্নেহে ভদ্রলোক তুলে ধরলেন শোভনকে। বললেন, থাক, থাক। ভালো আছো তো?

মনের দিক থেকে যেন অনেকখানি তৈরি হয়ে এসেছেন। আজ আর আপনি বলবেন না।

শোভন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। কোথায় একটা নিরাশার অনাসক্তি। চিত্রা আসেনি।

—ভেতরে আসুন।

সেই বসবার ঘর। আজ একটু আলাদা করে সাজানো। ফুলদানিতে টাটকা ফুল। মনোহর বুদ্ধি করে কয়েকটা ধূপ জ্বেলে দিয়েছিল, ধূপ আর ফুলের গন্ধে ঘরটা আমন্থর। জানলা-দরজায় নতুন পর্দা, নতুন টেবিলক্লথ। কিন্তু সব আয়োজন যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে এম্‌নি মনে হতে লাগল।

তিনজন বসলেন। শোভন মাথা নামিয়ে চেয়ে রইল কার্পেটের দিকে। মনোহর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল চায়ের ব্যবস্থা করতে। মামা আড়চোখে একবার তাকালেন শোভনের দিকে। হেসে বললেন, চিত্রা আজকে কিছুতেই আসতে চাইল না, বললে, শরীর ভালো নেই, আমরাও আর জোর করলুম না।

লজ্জায় আসেনি। কিন্তু কেন এই লজ্জা? পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো শক্ত শরীরের গঠন। এককালে নাকি হেতুয়ার জল তোলপাড় করে সাঁতার দিয়েছে সে। এটুকু নিতে পারল না স্পোর্টস্‌ম্যানের মতো?

মিস্টার কুণ্ডু নীরবে পাইপ টানলেন কিছুক্ষণ। চেয়ে রইলেন শোভনের দিকে, যেন নতুন করে দেখছেন তাকে, বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে চাইছেন আবার। অস্বস্তিতে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল শোভনের। এভাবে পরীক্ষা দিতে তার ভালো লাগছে না—মনের ভেতর কোথায় যেন বেসুরো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত।

মিস্টার কুণ্ডু গলা পরিষ্কার করে নিলেন একবার। বললেন, তা হলে কাজের কথাটা আলোচনা করে নেওয়া যাক ডক্টর ঘোষাল?

উইডোয়ার গ্রস্থকীট মামা ছেলে মানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। যেন কথাটার মধ্যেই মুখিয়ে ছিলেন এতক্ষণ, উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মিস্টার কুণ্ডু অ্যাশ-ট্রেতে পাইপটা ঝাড়লেন কিছুক্ষণ। আবার চোখ তুলে চাইলেন শোভনের দিকে।

—শুনেছ বোধ হয়, ডক্টর ঘোষাল আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ম্যারেজ প্রোপোজাল এনেছেন।

শোভন তেমনি মাথা নামিয়ে রইল, জবাব দিল না।

—ডক্টর ঘোষাল আমাদের অত্যন্ত আপনার জন, আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আমার দিক থেকে সেটা খুবই আনন্দের বিষয় হবে। আমি নিজে বিজনেস ম্যান, তোমার মত এণ্টারপ্রাইজিং অ্যাকটিভ ছেলে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া আমি আমার মেয়ের সঙ্গেও তোমার সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্কলি আলোচনা করেছি। দেখলুম, তোমার সম্পর্কে তার—একটু থেমে গিয়ে বললেন, শ্রদ্ধা আছে! আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'ইজ্‌ নট্‌ ইট্‌ টু আর্লি? এত সহজেই কি কাউকে চেনা যায়?' সে

জবাব দিয়েছে : 'ফার্স্ট ইম্‌প্রেশ্যন মানুষকে ঠকায় না বাবা। তাছাড়া পাঁচ বছর দেখেশুনেও তো শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়।' আমি বললুম 'রাইট।'

শোভনের বিরক্তি লাগছিল। কী দরকার ছিল এ-সব কথা তাকে শোনাবার? মনেব দিক থেকে কি এখনো ঠিক নিশ্চিত হতে পারেন নি ভদ্রলোক? চিত্রার একটুখানি মোহ আর মামার আগ্রহেই কি এতখানি এগিয়ে এসেছেন তিনি? চিত্রাকে নিয়ে শোভন মনে মনে স্বপ্ন গড়ত, বেশ ছিল। কিন্তু কেন সমস্ত জিনিসটাকে মামা এমন কুৎসিতভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন, কি প্রয়োজন ছিল এইসব স্থূল বৈষয়িকতাকে ঘুলিয়ে তোলবাব?

মনোহর টেবিলে চা আব জলখাবার সাজিয়ে আনল। মিস্টার কুণ্ডু বললেন, কী সর্বনাশ—এত কেন?

—আরে কুটুম হতে যাচ্ছেন, এখন তো আদর-আপ্যায়ন একটু দরকার।—মামা হা হা করে হেসে উঠলেন, কিন্তু তাঁর হাসিটা শোভনের কানে কুশ্রী ঠেকল। মামা বৈষয়িক নন, সংসার বোঝেন না, ফিলসফির পাতা থেকে সোজা জীবনে নেমে আসতে চান। কিন্তু মিস্টার কুণ্ডু অতোখানি ভাবসর্বস্ব নন; শোভন স্পষ্ট অনুভব করল, ভদ্রলোকের কপালে যেন একটুখানি ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে; মামার অনুরোধে আসতে হয়েছে বটে, কিন্তু যাচাই করবার পর্বটা এখনো যেন তাঁর শেষ হয়নি।

বলতে ইচ্ছে করল, দরকার নেই, চিত্রাকে নিয়ে চল্‌তি স্কুটারে কিংবা ঘুমভাঙা রাতে যে-স্বপ্ন আমি দেখি, তা-ই আমার সত্য হয়ে থাকুক, তার বেশি কিছুই আমার চাই না। কিন্তু মামার চোখ দুটো যেন আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে—যেন এই বিয়েটার ওপরে শোভনের নয়, তাঁরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমস্ত।

মামা বললেন, নিন—নিন, আগে চা-টা শেষ হোক।

ফিঙ্গার বোলে হাত ধুয়ে চা মিষ্টির সদ্গতি চলল কিছুক্ষণ। মামা

সন্দেশের তারিফ করলেন, আরো কেক চেয়ে নিলেন—এত খুশি হয়ে এমন করে খেতে এর আগে কোনোদিন শোভন তাঁকে দেখেনি।

চায়ের পাট শেষ হল। পাইপ ধরিয়ে আবার কথা শুরু করলেন কুণ্ডু।

—পোলট্রি ইজ্ এ গুড্ থিং। এখন তো তার দারুণ প্রস্‌পেক্‌ট্। ওর সঙ্গে একটা ডেয়ারী আর পিগারি লার্জ স্কেলে করতে পারলে আর কথাই নেই। তাই আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, বিয়ের পরই এ-সব নিয়ে স্টাডি করবার জন্যে তোমাকে কন্টিনেন্টে পাঠাব। তুমি সায়েন্স-গ্রাজুয়েট, সেদিক থেকেও সুবিধে আছে। এখানে তোমার বাবার আমলের বিশ্বাসী কর্মচারীরা আছেন, বছর দুই তাঁরাই ফার্মটাকে চালিয়ে নিতে পারবেন। আর তা ছাড়া আমিও মাঝে মাঝে লোক পাঠাব, তারা এসে দেখাশোনা করে যাবে। নাউ, টেল মী, এ সম্বন্ধে তোমার কী বলবার আছে?

শোভন একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল: আমার বলবার কিছুই নেই।

কথাটা কেড়ে নিলেন মামা: হাঁ, হাঁ, ওর যা বলবার আমিই তো সব বলেছি আপনাকে।

পাইপ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন মিস্টার কুণ্ডু: আমি জানি না, আমাদের সমাজ কিংবা আত্মীয়-স্বজন এতে খুশি হবে কিনা। বাট্ মাই ডটারস্ চয়েস্ অ্যাণ্ড্ আই লাইক্ ইউ। দ্যাট্স্ ফাইনাল।

আবার সেই অনিশ্চয়তা—নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সমাজ আত্মীয়স্বজন, অসম আর্থিক অবস্থা, একটাও ভুলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত জোরটা দিচ্ছেন ওই একটা কথার ওপর: 'মাই ডটারস্ চয়েস্!' তার সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন জুড়ে নিচ্ছেন 'অ্যাণ্ড্ আই লাইক ইউ!'

একটা অদ্ভুত বিস্বাদ অনুভূতিতে মনটা তিক্ত হয়ে যাচ্ছে। আলোচনাটা এখানে থামা উচিত। কারো অনুগ্রহ চায় না শোভন।

মনের আকাশেই চিত্রা জ্বলতে থাকুক চিত্রা নক্ষত্রটির মতো—এই সন্দেহ, অবিশ্বাস আর চাপা অসন্তোষের ভেতর দিয়ে সে কোনোদিন তাকে পেতে চায় না। তার চাইতে ছুটন্ত স্কুটার আর অন্ধকার মাঠই তার ভালো।

বাইরে যেন আর একটা গাড়ী থামার আওয়াজ। হয়তো বড় রাস্তায় কোনো চল্‌তি গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে। শোভনের বিস্বাদ মনটাকে আরো তিক্ত করে দিয়ে মামা বলে চললেন, আমি তো আপনাকে বলেছি মিস্টার কুণ্ডু, আমার ভাগনে খাঁটি সোনা। ওকে জামাই করলে আপনি ঠকবেন না।

যেন দরাদরির চেষ্টা, যেন বাজারে অচল জিনিস চালাতে চাইছেন এমনই একটা কাতর ভঙ্গি। শোভন ভাবছিল, আর কতক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবে, এমন সময় ঘরে ঢুকল মনোহর।

—চ্যাটার্জি সাহেব এসেছেন।

—কে?—ঘরের তিনজনেই চমকে উঠলেন একসঙ্গে।

—ঘোষদীঘির চ্যাটার্জি সাহেব।

মিস্টার কুণ্ডু জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন শোভনের দিকে। শোভন আস্তে আস্তে বললে, বাবার বন্ধু—রিটায়ার্ড সরকারী কর্মচারী। রাইস মিল করেছেন একটা।

মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, বুঝেছি, সেই লোকটা। তা এখন কেন? আর কি সময় পেল না?

শোভন বললে, আসতে বলো।

চ্যাটার্জি ঢুকলেন আধ মিনিট পরেই। পরনে খাকি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে সাদা শার্ট, মাথায় শোলা হ্যাট, হাতে ছোট একটা বেত। গোল ভারী চেহারা নিয়ে, জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে এলেন তিনি।

শোভন দাঁড়িয়ে উঠল: আসুন, আসুন কাকাবাবু। ভালো আছেন?

চ্যাটার্জি সাহেব জবাব দিলেন না। গম্ভীর কালো মুখে জিজ্ঞেস করলেন: এঁরা কারা?

—আমার মামা প্রফেসর ডক্টর ঘোষাল। ইনি মিস্টার পি. কে. কুণ্ডু, বিজ্‌নেস্‌ম্যান।

—নমস্কার।

এ পক্ষ থেকেও প্রতিনমস্কার হল।

চ্যাটার্জি সাহেবের ছুটো ক্ষিপ্ত চোখ আবার ঘুরে গেল শোভনের দিকে: তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট্‌ কথা আছে। একটু আড়ালে যেতে হবে।

কথার ভঙ্গিতে শোভনেব মন চমকে উঠল। পাওনা টাকা চাইবার পরে সে সম্পর্ক যে রফা করতে আসে, তার কথা এ রকম নয়। শোভন শক্ত গলায় বললে, এঁরা আমার আপন লোক। যা বলবার এঁদের সামনে বলতে পারেন আপনি।

—বলতে পারি তাহলে এঁদের সামনে?—বিচিত্রভাবে প্রতিধ্বনি করেন শ্রীধর।

—স্বচ্ছন্দে।

হাতের বেতটা টেবিলের ওপর ঠুকে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, তা হলে উত্তর দাও, কিছুদিন আগে এক রাত্রে আমার বাড়ীর আশ্রিতা মেয়ে অ্যানীকে স্কুটারে করে কলকাতা থেকে ঘোষদীঘিতে পৌঁছে দেবার ছলে পথের মধ্যে তাকে তুমি মোলেস্ট করেছ কিনা?

একটা অস্বাভাবিক আর্তনাদ করলেন মামা। মিস্টার কুণ্ডুর হাতের ধাক্কা লেগে টেবিল থেকে নীচে আছড়ে পড়ল অ্যাশট্রেটা। শোভন তীরবেগে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

—কী বলছেন আপনি?

টেবিলে আর একবার বেত ঠুকে চ্যাটার্জি বললেন, ডিনাই ইট! শৈলেশ্বর ব্যানার্জির ছেলে তুমি—ইট্‌স্‌ ইন্‌ ইয়োর ব্লাড—এ ছাড়া তুমি আর কী করতে পারো?

শোভন কথা বলতে পারল না, শুধু কাঁপতে লাগল থর থর করে। মামা চিৎকার করে উঠলেন: লায়ার—ওল্ড্ গোট্! বেরিয়ে যান এখান থেকে।

চ্যাটার্জি জবাব দিলেন না। শুধু শোভনের দিকে সেই বেতটা তেমনি করে বাড়িয়ে রেখে হিংস্র দানবিক গলায় বলে চললেন, ডিনাই ইট—ডিনাই ইট!

মামা বললেন, ইউ—ইউ—ইউ—

—দাঁড়ান ডাক্তার ঘোষাল, ডোন্ট্ গেট্ এক্সাইটেড। ডিনাই ইট্ শোভন! তুমি সেবার রাত্রে কলকাতা থেকে অনীতাকে স্কুটারে তুলে—হ্যাভনট ইউ জার্নিড দিজ্ লং থার্টি মাইল্স্?

—কে অনীতা?—মামা চিৎকার করলেন: পাগলের মতো যা তা বলে—

—থামো মামা।—পাংশু মুখে শোভন জবাব দিল: হ্যাঁ অনীতা—আপনার বাড়ীর সেই মেয়েটিকে স্কুটারে তুলে নিয়ে ত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছিলাম আমি। কারণ সেদিন ট্রেন ছিল না, বাস ছিল না, তার ফেরার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু—

কিন্তুর পরের অংশটা মামা আর শুনতে পেলেন না—ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারের ওপর? আর এইবার মিস্টার কুণ্ডুর হাত থেকে পাইপটাও খসে পড়ল মেজেতে।

তেরো

কুৎসিত নাটকটার কী কদর্যভাবেই যবনিকা পড়ল।

দুটি মানুষের বিহ্বল বিস্ফারিত চোখের সামনে শোভন কৈফিয়ৎ দিয়েছিল। অনীতাকে সে লিফ্‌ট্‌ দিয়েছিল বটে, কিন্তু—

কিন্তুতে চ্যাটার্জি সাহেবকে ভোলান যাবে না। অনীতা নিজে বলেছে, পথের মাঝখানে শোভন তাকে নানা কথায় ভোলাতে চেষ্টা করে। নির্জন রাস্তায় বিপদ বুঝে নানা কৌশলে তাকে ঠেকিয়ে রাখে অনীতা।

কিন্তু ঘোষ দীঘির মোড়ে পৌঁছে স্কুটার থেকে নেমে শোভন তাকে জড়িয়ে ধরে এবং অনীতার চিৎকার—

মিথ্যা! হোয়াইট লাইজ!

হোয়াইট্‌ লাইজ? মিলের দু'জন কুলি ছুটে এসেছিল অনীতার চীৎকারে। তারা সাক্ষী দেবে।

মিথ্যে সাক্ষী। বানানো।

কে সত্যি—কে মিথ্যে? তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ অনীতাই দেবে।

—একথা নিজে বলেছে সে?—শোভন রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

ইয়েস্‌—নিজেই বলেছে।

এত বড়ো মিথ্যা, এমন বীভৎস কদর্যতা লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষের মনে! সেই রোগা কালো মেয়েটি, ছায়ার মতো যে আসে যায়, চলবার সময় যার পায়ে এতটুকু শব্দ ওঠে না; একটা করুণ দীনতায় সে নিজের মধ্যে তলিয়ে আছে, যে কখনো কখনো নিজের নিঃসঙ্গ অবসরে বেহালার সুরের মধ্যে হারিয়ে যায়, যাকে দেখে মনে হয়েছিল কাছে থেকেও দূর সমুদ্রের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, এমন

একটা কুৎসিত অন্ধকার যে বয়ে বেড়াচ্ছে নিজের ভেতর ঘৃণায়, গ্লানিতে প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত থাকে না।

—এই প্রথম নয়।—আরো বিষ ঢেলে চ্যাটার্জি বলেছিলেন, তার সঙ্গে ইন্টিমেট হওয়ার চেষ্টা তুমি আগেও করেছ। একদিন আমি যখন বাড়ী ছিলুম না, ইউ ওয়েন্ট টু মাই প্লেস, গল্প করেছ তার সঙ্গে, বেহালা শুনতে চেয়েছ। ডিনাই ইট।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল শোভন, হয়তো কেটে রক্তও বেরিয়ে এসেছিল একবিন্দু। শোভন বলেছিল, অস্বীকার আমি করছি না, কিন্তু তার সঙ্গে—

—টু অ্যাণ্ড টু মেক্‌স্ এ ফোর।—নিষ্ঠুর হাসিতে চ্যাটার্জির মুখ ভরে উঠেছিল: যাই হোক, শৈলেশ ওয়াজ মাই ফ্রেণ্ড! তার যত দোষই থাক, আমি তাকে ভালোবাসতুম। তা ছাড়া তোমার বয়েস অল্প—এখনো ফিউচার আছে সামনে, আমি তোমার ক্ষতি করতে চাই না। কিন্তু নেক্‌স্‌ট টাইম—ইউ মেক এনি ফারদার অ্যাডভান্স অ্যাণ্ড ইট উইল বি এ পুলিশ কেস!

চ্যাটার্জি বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন কেনা গাড়ীতে।

ফাটা-বেলুন চুপসে যাওয়ার শীর্ণতায় মামা শুধু বলেছিলেন, লোকটা ডেঞ্জারাস্। ওর সমস্ত এ্যালিগেশনই মিথ্যে। কিন্তু কেন তুই লিফট দিয়েছিলি ওই মেয়েটাকে? সন্ধ্যের পর তাকে স্কুটারে চড়িয়ে ত্রিশ মাইল নিয়ে আসবার কী দরকার ছিল।

—উনি বিপদে পড়েছিলেন।

—সব বিপন্নকে রক্ষা করবার স্বর্গীয় দায়িত্ব দিয়ে ঈশ্বর তোমাকে পাঠাননি।—সীসের মতো শক্ত আর কালো হয়ে উঠেছিল মামার মুখ: তাছাড়া লোকটা যখন বাড়ীতে নেই, তার স্ত্রী নেই যেখানে, তুই কেন গিয়ে গল্প করেছিলি মেয়েটার সঙ্গে?

—চ্যাটার্জি সাহেব মাঝে মাঝে খবর নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

মিস্টার কুণ্ডু নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন পাইপটা। ব্যবসায়ী মানুষ জীবনে অনেক দেখেছেন, বিচলিত হলেও সেটাকে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে জানেন। একটু হেসে বলেছিলেন: যাক—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ সব পাড়া গাঁ অঞ্চলে সামান্য একটু ভুল করলেও তার অনেক বেশি খেসারৎ দিতে হয়। এখন এ নিয়ে টানাটানি করলে স্ক্যাণ্ডালই বেড়ে যাবে কেবল। —একটু থেমে বলেছিলেন, আমি বলছিলুম—ডক্টর ঘোষাল, এবার আমার কলকাতায় ফেরা দরকার। অনেকগুলো দরকারী কাজ পড়ে আছে।

মাথা নীচু করে মামা বলেছিলেন, আমাকেও যেতে হবে আপনার সঙ্গে। এখানে আর আমি থাকতে পারছি না। আর—আবছা গলায় ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, আমাকে মাপ করবেন মিস্টার কুণ্ডু। আগে বুঝতে পারলে আপনাকে আজ আমি কষ্ট দিতুম না।

মিস্টার কুণ্ডু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আর শোভন বুঝতে পেরেছিল তাঁর দিকে তাকিয়ে। বুঝেছিল, একটা অনিচ্ছার শৃঙ্খল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। দুশ্চরিত্র শৈলেশ্বর ব্যানার্জির দুর্বুদ্ধি ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব, এর পরে আর এক মুহূর্তও বেঁচে রইল না। কিন্তু ক ভাববে চিত্রা?

ওঁরা চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় যেন ভদ্রতার খাতিরেই মামা বলেছিলেন, সামনের সপ্তাহে কলকাতায় আসিস একবার সময় করে।

—আসব।

শুধু সমবেদনা যা ফুটেছিল মুকুন্দবাবুর মুখেই। কাছে এসে হাত রেখেছিলেন শোভনের কাঁধের ওপর।

—আপনি ভালোমানুষ স্যার, বাইরে থেকে এসেছেন, এ দেশের লোককে চেনেন না। সাংঘাতিক।

শোভন জবাব দেয়ান।

—আপনি মেয়েটাকে সাইকেলে করে নিয়ে এসেছেন, এ নিয়ে খানিকটা কানাঘুষো, হাসহাসি শুনেছিলুম। কিন্তু জিনিসটাকে যে শেষ পর্যন্ত এইভাবে ওরা দাঁড় করাবে, ভাবাই যায়নি—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, হয়তো এর জন্যে সব দোষই আমার। টাকাটার জন্যে চিঠি লিখিয়েছিলুম বলেই এইভাবে চ্যাটার্জি সাহেব আপনার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে।

—কিন্তু—কিন্তু—মেয়েটা এমনভাবে মিথ্যে কথা বলতে পারল? উপকারই তো করতে চেয়েছিলুম, তার বদলে—শোভন কথাটা শেষ করতে পারেনি, গলা ধরে এসেছিল তার।

—দুধ খাওয়ালেই তো সাপের জোর বাড়ে স্যার। তখনই সে ফণা তুলে ছোবল দেয়। সে যাক, ভুল যা হওয়াব হয়েই গেছে। এ নিয়ে আর আপনি মন খারাপ করবেন না স্যার, শক্ত হোন। এ সব কুৎসা-নিন্দে দু দিন পরেই লোকে ভুলে যায়। আপনিও ভুলে যেতে পারবেন।

শোভন আবক্ত চোখে একবার চাইল মুকুন্দের দিকে।

—কিন্তু টাকাটা?

মুকুন্দবাবু শীর্ণ স্বরে বললেন, এখন থাক।

—থাকবে কেন? ফার্মের টাকা—ন্যায্য পাওনা। উকিলের নোটিশ দিন।—আরক্ত চোখ জ্বলতে লাগল শোভনের: পাওনা টাকার একটা পয়সাও ছাড়া যাবে না। আদায় করতে হবে ইণ্টারেস্ট শুদ্ধ।

—দেখি। তামাদির মাস তিনেক দেরী আছে এখনো।

তাই দেখুন মুকুন্দবাবু তিন মাস সময় আছে—নোটিশ দেবার, মামলা করবার মতো যথেষ্ট সময় আছে হাতে। কিন্তু শোভনের আর উৎসাহ নেই। চিত্রার জন্যে তার দুঃখ নেই—ক্ষোভ নেই; অসম্ভবের প্রাসাদ শূন্যেই মিলায়। তার জন্যে যেটুকু মনোভঙ্গ তার সবটাই মামার। শোভনের ভাবনা নেই সেজন্যে।

দেওয়ালে জোড়া এস, ব্যানার্জির ছবি। শিল্পীর উজ্জ্বল মন দীপ্ত হয়ে আছে ছবিগুলোতে, শেলফের কবিতার বইতে, সাজানো বাংলোয়, সুন্দর বাগানে। কিন্তু ভেতরের পাপ যাবে কোথায়? সেই চরিত্রহীন মাতাল লোকটা—দুর্যোগের রাতে স্ত্রী পুত্রকে যে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল, তার সেই দুষ্কৃতির কালো স্রোত সব কিছুর ভেতব দিয়ে বয়ে চলেছে দুর্গন্ধ পঙ্কিলতায়। তার হাত থেকে মুক্তি কোথায় শোভনের?

অথচ, কিছুদিনের জন্যে শোভন ভুলতে পেরেছিল। ভুলতে পেবেছিল চাবুকেব ঘায়ে ঘায়ে সর্বাঙ্গ জর্জবিত হয়ে গেছে, শাদা পিঠের ওপব সেই কালো কালো সবীসৃপ চিহ্নগুলোকে। সেই চোখের জলের স্মৃতিগুলো আবছা হয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

তারই প্রায়শ্চিত্ত।

সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ বাড়ীর—এই পোলট্রির—শৈলেশ্বরের এই সম্পত্তিব, সে কেউ নয়। এই অভিশাপের মধ্যে আব সে থাকতে পাববে না। তার আগ্রাই ভালো। সেই পুবনো জীবন, সেই সাইকেল আর মোটর পার্টসের ব্যবসা, তার মায়ের স্মৃতি, সেই ঢেউখেলানো দীর্ঘ কালো পথ, দুপাশে মেঘবরণ অড়হরেব ক্ষেত, দুর্গের মতো পুবনো জমিদার বাড়ী, সেই ভাঙ্গা মসজিদ, বৃষ্টি-রোদ-শ্যাওলায় কালো হয়ে যাওয়া পুরনো কবর আর পীরের দরগাহ্।

সেই ভালো।

দিন দুই পরে আবার মুকুন্দবাবুকে ডাকল সে।

—শুনুন, আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে।

মুকুন্দবাবু তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

—আমি একবার আগ্রায় যাব মাসখানেকের জন্যে। ওখানে আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে জানেন বোধ হয়, সেটা একবার দেখে আসা দরকার।

মুকুন্দবাবু বাধা দিলেন না। বললেন, বেশ যান।

মনে মনে ভাবলেন, যাওয়াই ভালো। যে আত্মীয়েরা গোড়া থেকে শত্রুতা করছিল তারা তো আছেই, তা ছাড়া সমস্ত গ্রামে একটা কুৎসার ভুতুড়ে তাণ্ডব চলছে এখন, কোথাও যেন কান পাতা যায় না। বলাই তো এ নিয়ে কা'র সঙ্গে হাতাহাতিরই উপক্রম করেছিল। শোভন ঘুরে আসুক কিছুদিন। লোকের মুখ একটু বন্ধ হোক—শোভনের মাথাটাও ঠাণ্ডা হোক একটু।

আবার বললেন, বেশ ঘুরেই আসুন। আমরা এ দিকের সব দেখছি, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

ভাবনার কিছু নেই শোভনের। এখানে আসবার পর এমন নির্ভাবনা সে কোনো দিন হয়নি।

মুকুন্দবাবু চলে যাওয়ার পর তার নজর পড়ল, আজও ফুলদানিতে কয়েকটা টাটকা ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেছে মনোহর। ফুল! একটা হিংস্র আকাঙ্ক্ষার বেগ এবার আর কিছুতেই সে রোধ করতে পারল না, ফুলগুলোকে তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে বাইরের নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়ে এল।

রাত সাড়ে দশটা। শোভন ভাবছিল, এই দমবন্ধ করা বাড়িতে, রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কেমন করে কাটানো যায় আর। কাল ভোরেই সে স্কুটার নিয়ে চলে যাবে। তারপর কলকাতায়। গিয়ে উঠবে একটা হোটেলে। সামান্য কিছু টাকা আছে, আর স্কুটারটাও একেবারে নতুন—বিক্রী করে দিলে অন্তত হাজার টাকার কাছাকাছি দাম পাওয়া যাবে। তারপর আগ্রা। তারপর—

তারপর সে আর ফিরবে না। শৈলেশ্বরের সম্পত্তি ছাড়াই এতদিন তার চলছিল, এখনো চলে যাবে। যা তার নয়, যার বাইরে সমস্ত শিল্পরুচির আড়ালে ক্লেদ আর গ্লানির একটা অন্ধ তরঙ্গ, যার ওপর তার মায়ের চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়েছে, তার কোনো দাবি নেই তাতে। ও যারা চেয়েছিল, তারাই নিক। শোভন তার মায়ের ছেলে—শৈলেশ্বর ব্যানার্জি তার কেউ নয়।

কী নেওয়া যাবে? একটা ছোট সুটকেস—যা তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। তার বেশি কিছুই দরকার নেই তার।

শোভন ভাবছিল ভোরে যেতে হলে এখনই সুট্‌কেসটা গুছিয়ে নেওয়া দরকার, এমন সময় দরজায় টক টক করে টোকা পড়ল কয়েকটা।

—কে?

জবাব এল না, টোকা পড়ল আবার।

নিশ্চয় বলাইবাবু কিংবা মনোহর। মুকুন্দবাবু ডাক দিয়ে আসেন, এত দ্বিধা করেন না। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল শোভনের। আর কি বিরক্ত করবার সময় পেলনা এত রাত ছাড়া? সব কাজের কথা তো হয়ে গেছে, সে তো জানিয়েই দিয়েছে কাল ভোরেই কলকাতায় চলে যাবে।

বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল। সেই গোল করে পাকানো ছাতা। সেই খাকী রঙের পাঞ্জাবী। অশ্বিনী হালদার।

ইচ্ছে করল, ঘাড় ধরে লোকটাকে বাইরে অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে। বললে, কী চাই আপনার এত রাত্রে?

মাথা নীচু করে অশ্বিনী বললেন, আপনার সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই। কথা কইবার সাহসও নেই। তবু কিছু বলতেই হবে। মিনিট দশেক সময় দেবেন আশা করি?

এই রাত্রে, এই নির্জনতায় একটা নরহত্যা করলে কী হয়? এই লোকটাই তো অনীতার সবচেয়ে বিশ্বস্ত, তার চক্রান্তের শরিক। এখনই এর গলা টিপে ধরলে আইনত, ধর্মত কি কোনো অপরাধ হয় কোথাও?

দাঁতে দাঁত চেপে শোভন বললে, আসুন।

অশ্বিনী এলেন। কিছুক্ষণ বসে রইলেন ঝিম ধরে। তারপর ঘোলাটে চোখ তুলে বললেন, বিশ্বাস করবেন একটা কথা? যা ঘটেছে তার জন্যে অনীতা মা-র কোনো দোষ ছিল না।

—না, সব দোষ আমার।—একটা চুরুট ধরাতে যাচ্ছিল শোভন, তার আগেই সেটাকে নখের ডগায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল : কোনো কৈফিয়তের দরকার নেই।

—আপনি রাগ করতে পারেন, করাও উচিত।—কিন্তু অশ্বিনী যেন একবার পাঞ্জাবীর হাতায় চোখ মুছে নিলেন : তবু সব আপনাকে জানানো দবকাব। এ সব কথা চ্যাটার্জি সাহেব জোর করে ওকে দিয়ে বলিয়েছেন। ওব না বলে উপায় ছিল না।

—এত বড়ো মিথ্যাটাও না বলে উপায় ছিল না?—শোভন হাসতে চেষ্টা করল, তার হাসি থেকে ঝবতে লাগল বিষ : উনি বোধ হয় সাহেবের ক্রীতদাসী?

—ঠিক তাই।

—তার মানে?

অশ্বিনী আবার চুপ কবে রইলেন, দেওয়ালের গায়ে দুঃসাহসী ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই অভ্যাসে মাথা নামালেন, তাবপর ঝাপসা গলায় বললেন, জানেন, অনীতা চ্যাটার্জি সাহেবেব আপন মেয়ে।

—আপন মেয়ে?—দারুণ ভয়ে চমকে উঠল শোভন : কী বলছেন মশাই? উনি নিজে বলেন কুক্—বলেন আশ্রিতা—

অশ্বিনী তিক্তভাবে বললেন, নিজের পাপ ঢাকতে গেলে কী আর বলবেন? একটি অল্প বয়সী ঝি কাজ করত ওঁর বাড়ীতে। তার সঙ্গে ওঁব মেলামেশার ফল এই মেয়ে। তারপর মেম সাহেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলাদা হয়ে যান—স্বামীর কাছে আর ফেরেন নি। ব্যাপারটা নিয়ে সরকাবী মহলেও গণ্ডগোল হয়েছিল, নানা ধরাধরি কবে চাপা দেন সমস্ত।

—তা হলে অনীতা—

অশ্বিনী ঝিম মেরে রইলেন কিছুক্ষণ।

—সেই ঝিয়ের মেয়ে। বছর পাঁচেক ছিল ওঁর কাছে ঝিটা, একদিন মেয়েকে ফেলে পালায়। সাহেব আর কী করবেন, আশ্রিতা

পরিচয় দিয়েই মেয়েটাকে লালন-পালন করতে থাকেন। লেখাপড়াও শেখান খানিক দূর পর্যন্ত। কিন্তু সাবা জীবন বিষ নজবে দেখেছেন, একদিনের জন্যেও মেয়ে বলে স্বীকার করেন নি।

শোভন স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই সুদৃঢ় দুর্বোধ মনটার ওপর একটুকরো আলো যেন পড়ছে এতক্ষণে।

অশ্বিনী বললেন, সেখানেই শেষ নয়। স্কুলফাইন্যালের আগে অনীতা পড়ল টাইফয়েডে, সেরে উঠল, কিন্তু দু-তিন বছর ধরে কেমন হাবা হয়ে রইল, কিছু যেন ভালো করে বুঝতেই পারে না। তার সুযোগ নিলে একজন। সে ওঁবই খুব প্রিয় অল্প বয়েসী অফিসার একজন। বাড়ীতে মেযেছেলে নেই, চ্যাটার্জি সাহেব না থাকলেও আসা যাওয়া কবত, মেয়েটাকে বলেছিল বিয়ে করবে। তারপর—

অশ্বিনীব কপাল দিয়ে টপ টপ কবে ঘাম পড়তে লাগল : বলতে লজ্জা হচ্ছে, অসুস্থ হাবা মেয়েটা মা-ব ভুলটাই করে বসল। অফিসাবটি তখন বদলী হয়ে গেছেন, কোথায় এক বড়লোকের মেয়ে বিয়েও কবে বসে আছেন। আব এদিকে—

চেয়াবের মধ্যে জমে যেতে লাগল শোভন।

—গণ্ডগোল চ্যাটার্জি সাহেব তুলতে পাবলেন না, কোনো কেলেঙ্কারী উঠলে মেয়েব আসল পবিচয়ও চাপা থাকবে না। মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন, হাতুড়ে দিয়ে কী ব্যবস্থা করলেন, মরতে মরতে সেবে উঠল মেয়েটা। তারপব থেকে অত্যাচাবের পালা চরমে উঠেছে। কুৎসিত গাল দিয়ে বলেন, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব— সব ফাঁস করে দেব। দাঁড়াবি কোনখানে? তাই চ্যাটার্জি সাহেবের ভয়ে আপনার নামে ও—

শোভন নিঃশব্দ স্বরে বললে, বুঝেছি।

—ওর অবস্থাটা ভাবুন। ছেলে মানুষ, অসুস্থ, মানুষকে বিশ্বাস করেছিল, তার দামই আজ ওকে দিতে হচ্ছে। এখনও বাঁচতে চায়, পালাতে চায়, এই নাগপাশ থেকে যে ভাবে হোক বেরিয়ে যেতে চায়।

তাই আমি আপনার কাছে ওর জন্যে চাকরির দরবার করতে এসেছিলুম। কিন্তু ঘটনাচক্রে আপনার যে এমন ক্ষতি হয়ে যাবে—

পাঞ্জাবীর আস্তিনে আবার চোখের জল মুছে ফেললেন অশ্বিনী।

বাইরে জ্যোৎস্না। নৈঃশব্দ্য। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ। ঝিঁঝির ডাক। সব অবাস্তব। চিত্রার রূপকথা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর এক কাহিনী।

অশ্বিনী বললে, কিছু যদি মনে না করেন, একবার অনীতা মা-কে ডেকে আনব কি?

চমকে শোভন বললে, কোথায় তিনি?

—বাইরে দাঁড়িয়ে। ক্ষমা চাইতে এসেছে আপনার কাছে। চ্যাটার্জি সাহেব আজ আবার কলকাতা গেছেন সেই সুযোগেই তো আমরা আসতে পারলুম। ডাকব তাকে?

শোভন বললে, দরকার নেই। আমি ক্ষমা করেছি।

—একবার—

ক্লান্ত স্বরে শোভন বললে, মাপ করবেন। লজ্জার মধ্যে যিনি তলিয়েই আছেন, নতুন করে তাঁকে আর লজ্জা দেবেন না। তা ছাড়া আমায় এখন একটু বিশ্রাম করতে দিন। কাল ভোর পাঁচটার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে।

—কোথায় যাবেন?

—আগ্রা।

—কবে ফিরবেন?

—হয়তো এক মাস পরে। হয়তো কোনোদিনই নয়।

হয়তো কোনদিনই নয়। সমস্ত বিনিদ্র রাত্রির সেইটেই শেষ সিদ্ধান্ত। তবু যাওয়ার আগে মনের ভার হালকা হয়ে গেছে অনেকখানি। তার চাইতেও ঢের বড়ো লজ্জা অনেক বড়ো অপমানের

মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর একজন। সেই লম্বা, রোগা, কালো মেয়েটি। সমাজ, মানুষ, স্বাভাবিক জীবনের থেকে অনেক দূরের সমুদ্রের ওপারে সে দাঁড়িয়ে। শোভনের তবু তো মা-র স্মৃতি আছে, আগ্রা আছে। কিন্তু কি রইল এই মেয়েটির? কিন্তু সে কেন ভাবতে যাবে? কী দায় তার? মামাই ঠিক বলেছিলেন। পৃথিবীর সব মানুষেব ভালো করবার স্বর্গীয় দায়িত্ব নিয়ে ঈশ্বর তাকে পাঠান নি। আর সে ভাবনার কী দাম যে দিতে হয়, তা-ও জানতে বাকী নেই আর।

পোলট্রির মোরগের ডাকে ভোব। এখনো অন্ধকার পাতায় পাতায় ছলোছলো শিশির। বাগানে সদ্য ফোটা শিউলির গন্ধ। শরৎ আসছে।

মনোহর অনেক আগেই চা আর খাবার তৈরী করতে বসেছিল। শোভন জামা কাপড় পরতে পরতেই নিয়ে এল। স্কুটারে বেঁধে দিলে সুটকেসটা।

পাঁচটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শোভন। কাতর চোখে মনোহর চেয়ে রইল পথেব দিকে। অনেকটা বুঝেছে, কিন্তু সবটা বুঝতে পারেনি।

ফাঁকা পথে তরল অন্ধকার। ঘুমন্ত গ্রাম। শেষ রাত্রির হাওয়া। মুক্তি? মুক্তি ছাড়া আর কী। হঠাৎ চমক লাগল। একটা কালভার্টের পেছন থেকে কে ডাকছে: শোভনবাবু—শোভনবাবু—

শোভন থেমে পড়ল। আবছা অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে একটি মেয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। পরনে সাদা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ। হাতে ছোট পুঁটলি একটা। অনীতা।

দ্রুত স্কুটার চালিয়ে পালানো উচিত ছিল, পালানো গেল না। হাঁপাতে হাঁপাতে অনীতা এসে দাঁড়ালো। সামনে। মাটিতে বসে পড়ে একখানা পা জড়িয়ে ধরল তার। টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

—কী করছেন—কী করছেন! এই রাস্তার ভেতর—

অনীতা উঠে দাঁড়ালো। মুখের ওপর দিয়ে বন্যার ধারা নামছে তার।

—হোক রাস্তার ভেতর। কাল রাতে ফিরে গিয়েও স্থির থাকতে পারিনি। আবার পালিয়ে এসেছি। জানি, ভোরবেলা এই পথ দিয়েই আপনি যাবেন। তাই কালভার্টের নীচে লুকিয়ে বসেছিলুম। আমায় মাপ করেছেন?

—করেছি বই কি।—কিন্তু আপনি এই অন্ধকারে—কালভার্টের নীচে—

—সাপে কামড়াত, এই তো? কিন্তু সে আমার কাছে কিছু নয়। যাক, আপনি ক্ষমা করেছেন, এইবাব নিজের পথ আমার সামনে।

—কোথায় যাবেন?

—জানি না। ঘোষদীঘিতে আর ফিবব না। প্রথম বাস এলে উঠে বসব: তাবপর যেদিকে চোখ চলে—

আঁচলে চোখ মুছল অনীতা: যাক, আপনি যান।

—প্রথম বাস তো সাড়ে পাঁচটা, পৌনে ছ'টায়। এখনো চল্লিশ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন?—শোভন স্থির দৃষ্টিতে চাইল অনীতার দিকে: একা?

—একা ছাড়া আমাব কে আছে?

একবার ইতস্তত করল শোভন, একবার জীবনের সব চাইতে বড়ো সমস্যাটার মুখোমুখি হল। তারপর মৃদু গলায় বললে, একার কথা পরে ভাবা যাবে। এখন আমার স্কুটারে উঠে বসুন।

—কী বলছেন আপনি?—অনীতা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—ঠিক বলছি। শোভন তার মুখের দিকে চেয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে—চেনা যায়, ঠিক চেনা যায়। তার মায়ের মতোই আর একজন। আরো দুর্ভাগিনী—আরো অনেক চোখের জলের অতলে ডুবে আছে সে।

শোভন বললে, আসুন।

—এর পরেও ?

—এই তো সত্যিকারের সময়। দেরী করবেন না। উঠে পড়ুন লক্ষ্মী মেয়ের মতো।

স্কুটার ছুটল।

সেই শাড়ীব আঁচল, সেই স্পর্শ, সেই মোহ। এব শেষ কোথায় ?

কিন্তু পথ কোথায় শেষ হয়—পথই কি জানে ? শোভনেব জানবারই কী গরজ ? আপাতত কলকাতা। তারপর আবাব নতুন পথ শুরু হবে কিনা কে বলতে পারে।

"মেবে জিন্দগী আঁধেবে মেঁ—"

চিত্রা ? না—চিত্রা নয়। এবাব অনীতা।

—শেষ—